সোনা নয় রুপো নয়

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য



আর, এন, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং
২৩, নির্মলচন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক—শ্রীসুব্রত চট্টোপাধ্যায়
২৩, নির্মলচন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রশান্তকুমার মান্না
মহাকালী প্রেস
৩৪-বি ব্রজনাথ মিত্র লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ কল্পনা—বিভূতি সেনগুপ্ত

মূল্য আড়াই টাকা

উৎসর্গ

শ্রীসাধন চট্টোপাধ্যায়
সমীপেষু—

নিবেদন

'সোনা নয় রুপো নয়' ত্ব'টি গল্পের একত্রীকরণ। রসবিচারের ক্ষেত্রে গল্প ত্ব'টি সত্যিই কিছু সোনা নয় রুপো নয়। তবু হয়ত এরও প্রয়োজন আছে। কারণ পাঠের আরাম পাওয়ার কোন নির্দিষ্ট সীমানা নেই। কেউ কেউ হয়ত এই গল্পের আয়োজন থেকেই রসের প্রয়োজনকে খুঁজে নিতে পারবেন। তাই—। গল্প ত্ব'টির প্রথমটি 'সিনেমা জগৎ' পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যায় এবং দ্বিতীয়টি 'বসুমতী'র শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তবে, তার ওপর কিছু সংস্কারসাধন হয়েছে।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

সোনা নয় রুপো নয়



—বাদল, তোমাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে লাভ নেই। You are suffering from the most modern disease of our age. তুমি Radio-active হয়ে গিয়েছ। প্রথমটায় আমি ঠিক ধরতে পারিনি। ওদের ট্রেনিং সাহেব যেন আর দলের ডক্টর দেশমুখ যখন এলেন, ওঁদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। দেশমুখও এই সিদ্ধান্তই [illegible] করেছেন।

—তার মানে কি, হিমাদ্রি?

হিমাদ্রির বলতে কষ্ট হয়। তবু ডাক্তারের কর্তব্য বড় কঠিন। সে বলে—এর প্রথমেই ত্বকের রক্তশূন্যতা দেখা দেয়, আর তারপর… সত্যি বলব বাদল, এর কোন চিকিৎসা নেই।

—অর্থাৎ…

…অর্থাৎ এক্ষেত্রে ডাক্তার হিসাবে আমি কোন ভরসা দিতে পারি না বাদল। আরো পরিষ্কার করে বলাই ভাল। বছরখানেকের মধ্যেই… এক বছরের মাথায়… বাদল, তুমি দুঃখ করো না, মরতে তো একদিন হবেই ভাই। তোমাকে, আমাকে…আমাকেই এই কথাগুলো বলতে হলো…আমার যে কি রকম লাগছে…

বাদল নাগ তাকিয়ে রইলো। শুনতে শুনতে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো ঝিমিয়ে এল। তবু তার আরো শুনতে ইচ্ছে হলো। বললো,—তারপর?

হিমাদ্রি কপাল চেপে ধরলো। বললো—শরীর Radio-active হয়ে গেলে মৃত্যু যেভাবে আসে তাই-ই আসবে। অর্থাৎ কর্মক্ষমতা কমে আসবে। আস্তে আস্তে…

—সিনেমার কোন কোন দৃশ্যের মতো fade out করে যাব?

হিমাদ্রি চুপ করে রইলো। তারপর বললো—যদি চাও, আমরা আরো পরামর্শ করতে পারি। তুমি যদি বম্বে যেতে চাও, অথবা বিলেত···পয়সার ত' অভাব নেই তোমার!

—না হিমাদ্রি, তার প্রয়োজন নেই।

মাঝখানে টেবিলটা রেখে দুজনে চেয়ে রইলো দুজনের দিকে। বাদলের মনে হলো তার জলতেষ্টা পেয়েছে। হিমাদ্রিকে বললো—একটু জল খেলে হতো।

হিমাদ্রি উঠে গিয়ে জল ঢাললো। কাগজের একটা গেলাস। বাদল জল খেতে গেলাসটা সে বাস্কেটে ফেলে দিলো। বাদলের মনে হলো বোধহয়, বাদল এখনই হিমাদ্রির কাছে ঐ বাস্কেটটায় ফেলা ভাঙা ইঞ্জেকসানের এ্যাম্পুল, কাগজের গেলাস, ছেঁড়া তুলো এবং ব্যাণ্ডেজের মতো বাতিল হয়ে গিয়েছে। পুরানো ওষুধের কেসের ওপর 'Condemned' লিখে হিমাদ্রি সেগুলো নষ্ট করে ফেলতে বলে—বাদলও কি তেমনিই কোন ছাপ পেয়ে গিয়েছে?

বাদল উঠে পড়লো। উঠে বেরিয়ে যাবার সময় হিমাদ্রিকে বললো—প্রতিমা কোথায়?

—ওপরে আছে। তার সঙ্গে আর দেখা না-ই করলে বাদল।

বাদল তাকিয়ে রইলো হিমাদ্রির দিকে। এর মধ্যেই তাহলে তার মধ্যে এবং অন্যান্য মানুষের মধ্যে সুস্পষ্ট একটা সীমারেখা টানা হয়ে গিয়েছে! প্রতিমার সঙ্গে দেখা করার আর দরকার নেই তার?

হিমাদ্রি আবার বললো—তুমি ভাল করেই জান, কি সেন্টিমেণ্টাল মেয়ে প্রতিমা। আর তোমার সম্পর্কে তার···এখন কি আর উচিত তোমার সঙ্গে মেলামেশা, মানে···বুঝতেই ত' পারছ, ও আমার একমাত্র বোন, ওর যদি কোন কারণে মনে আঘাত লাগে··· তোমার সম্পর্কে এমন একটা কথা জানলে ও কি সহ্য করতে পারবে? আমিই ওকে বলবো, বুঝিয়ে বলবো।

বাদলের হঠাৎ একটা কথা মনে হলো। হাসতে চেষ্টা করে দেখলো, মুখের ভেতরটা এমন শুকিয়ে গিয়েছে যে, হাসতে পারছে না সে। বললো—হিমাদ্রি, Radio-active কেন হয় মানুষ, কোন কারণ দেখাতে পারেন কি ডাক্তাররা ?

হিমাদ্রি বললো—সমুদ্রে স্নান করবার পর থেকেই ত' হলো ব্যাপারটা। কি জান, ইদানীং অ্যাটমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ত' অন্ত নেই। বিশেষ করে এই দিকের সমুদ্রগুলোতে, জাপানের পরেই··· আমিও ঠিক জানি না···জানি না বলেই ত' আগে বুঝতে পারিনি··· যদি সব-ই বোঝা যাবে, তাহলে আর ডাক্তাররা, বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে এত ভাববেন কেন ?···তাই থেকেই···থাক বাদল, এ আর তুমি শুনতে চেও না।

বাদলের মুখের দিকে চেয়ে আজ হিমাদ্রিও সেন্টিমেণ্টাল হয়ে গেল। চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ে কাছে এসে কাঁধে হাত রাখল। বললো—বাদল, আমাকে বলতে হলো কথাগুলো—আমি দুঃখিত।

বেরিয়ে এল বাদল। বাইরে এসে একবার ওপরের দিকে তাকাল। যে ঘরে বাতি জ্বলছে সেখানেই আছে প্রতিমা। এমন কিছু দূরে নয়। সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেলেই সে তার সঙ্গে দেখা করতে পারে।

আর তা সম্ভব নয়। এতদিন প্রতিমার সম্পর্কে সে তেমন করে ভাবেনি। অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে প্রতিমাও মিলে মিশে ছিল। এ-ও বলা চলে যে, দুর্বলতা যা ছিল, প্রতিমার চোখেই ছিল। বাদলের তা ভালো লাগত। আর প্রতিমাও নীরব স্তুতি জানিয়ে খুশি ছিল।

আজকে সেই প্রতিমাকে বড় মূল্যবান, বড় মহার্ঘ মনে হচ্ছে।

গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে এ-পথ ও-পথ দিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে কিছুক্ষণ ঘুরলে বোধহয় ভাল লাগবে। সন্ধ্যার কলকাতাটা যে

কেমন, তা যেন বাদল অনেকদিন দেখেনি। ' ট্রাফিক পুলিশ রাস্তা নিয়ন্ত্রণ করছে, সারাদিনের পর একটু বিশ্রান্তিতে গা ঢেলে দেওয়ার আশায় চৌরঙ্গীতে হেঁটে চলেছে মানুষ, বাসের স্টপে মানুষের ভীড়, 'নীরা'-র পাশে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক আপনমনে খাতায় কি লিখছেন—বাদল জানে সে খাতায় একটা আঁচড়ও পড়ছে না—ওটাই ওঁর পাগলামি, এবং ঐ একই ভাবে, অনেকদিন ধরে ওঁকে এখানে এবং আশেপাশে দেখেছে সে। ময়লা পায়জামা পরে ছোকরারা বাবুদের জন্যে ট্যাক্সি ধরতে ছোটাছুটি করছে, বিকলাঙ্গ ভিখিরীটা ফুটপাথের ধূলোয় গড়িয়ে গড়িয়ে ভিক্ষে চাইছে। এই সব দৃশ্য অতি পরিচিত। এত পরিচিত যে চোখেই পড়তে চায় না। আজ বাদলের মনে হলো এ বিধাতার একটা অদ্ভুত অবিচার। এই সব লোকগুলো, এমন কি ঐ ভিখিরীটা পর্যন্ত বেঁচে থাকবে—একা সে-ই থাকবে না। সে—বাদল নাগ—যার জন্মের জন্যে পৃথিবীতে এত অপেক্ষা, এত আয়োজন ছিল—এবং যে শুধু কোনমতে মন খুশি করে বেঁচে থাকলেই তার চেনা-জানা দুনিয়াটা ধন্য মনে করতো, তাকে একত্রিশ বছর হলেই চলে যেতে হবে।

হঠাৎ বাদল আবিষ্কার করলো তার চোখে জল। চোখে রুমাল চেপে ধরে সে গাড়ি থেকে নামল। সিঁড়ি পেরিয়ে, হলঘর পেরিয়ে দোতলায় নিজের ঘরে উঠে গিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। এমন ভেঙে পড়লে চলবে না—ভাবতে তাকে হবেই—এবং নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। তবু আজ রাতে বাদল কিছু ভাবতে পারল না। নিজের হাত দুখানার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। ভাবতে চেষ্টা করলো, কোথাও এই পরিণতির কথা লেখা ছিল কি না!

বাদলের জন্ম নাগবাড়িতে একটা স্মরণীয় ঘটনা। বিহারের এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল সুরেশ্বর নাগের গোঁফজোড়া ছিল দেখবার মতো। একদা গোঁফের আগা সরু করে মোম দিয়ে পাকিয়ে কাঁধে

শাল ফেলে তিনি যখন বাগানে পায়চারী করছিলেন, কোন সাহেব তাঁকে দেখে বলেছিলেন—Who is that man, walking like a Roman Emperor ?

কথাটা তাঁর ভালো লেগেছিল। একবার মনে হয়েছিল, রোমের সম্রাটরাও ত' ভারতের সিল্ক ব্যবহার করেন! তাঁর কাঁধের শালটা যে খাঁটি কাশ্মীরি—দাম যে তার পাঁচশো টাকা—সেই বুঝেই হয়তো সাহেব কথাটা বললো। তার পরে সংশয় হয়েছিল, না, সাহেব নিশ্চয় অতটা বোঝেনি। পুলিসের বড়কর্তা, সে কি আর শাল খাঁটি না ভেজাল তা বুঝবে? এ নিশ্চয় তাঁর গোঁফজোড়া এবং দৃপ্ত পদচারণার প্রাপ্য প্রশংসা।

অতএব, সেই গোঁফ এবং সেই পায়চারি তিনি অবসর গ্রহণ করলেও ত্যাগ করেননি। সবদিকেই কৃতকর্মা পুরুষ ছিলেন, কর্মণ্যেবাধিকারস্তে নীতি অনুসরণ করে চলেছেন—গোঁফজোড়াটি মানাতো ভাল।

ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংরেজ সেনানায়কদের মত সুরেশ্বর জীবনের সব প্রতিবন্ধকতাই সোজাসুজি আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার নীতিতে বিশ্বাস করতেন। তিনি কোন কাজে ব্রতী হলে, ভাগ্য যে তাতে বাধা দিতে পারে, তা তিনি ভাবতে পারতেন না।

কিন্তু এক জায়গায় তাঁর হিসেব গোলমাল হয়ে গেল। স্ত্রী এবং ভাগ্য যুগপৎ তাঁকে দাগা দিয়ে গেলো। পর পর যে কয়টি সন্তান হলো, কেউই বাঁচল না। সুরেশ্বরের মনে হলো তিনি হেরে যাচ্ছেন। কি চাকরিক্ষেত্রে, কি ব্যক্তিগত জীবনে, যে বিষয়ে একবার ঝুঁকতেন সেটিকে শক্ত হাতে ধরে হয় এস্পার, নয় ওস্পার—একটা মীমাংসা না করে তিনি ছাড়তেন না।

এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। কলকাতার সমস্ত ডাক্তারদের এনে বাড়ি ভরে ফেললেন। সকলে সরমাকে দেখেশুনে রায় দিলেন, না, ডাক্তারী শাস্ত্রে এর নিশানা পাওয়া যাচ্ছে না।

থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে শেখালেন। মাঠে নেমে খেলা করেনি। খালি পায়ে হাঁটেনি। এমন কি বর্ষার সময়ে আকাশের দিকে চেয়ে সুরেশ্বর অসন্তুষ্ট ভাবে ক্রোধ প্রকাশ করতেন। পাছে ঠাণ্ডা লেগে বাদলের নিউমোনিয়া হয়। নিজে একটি fly catcher কিনেছিলেন।

তারপর থেকে বাদলের বয়সটাই বাড়তে লাগল। অন্য সকল দায়ভার সুরেশ্বর নিলেন। ফলে এমন দাঁড়াল অবস্থা যে, নাম জিজ্ঞাসা করলেও বাদলের মুখে জবাব আসত—বাবা জানেন।

অবশ্য পরে কলেজে ঢুকে বন্ধুবান্ধব তাকে এই নিয়ে কম ঠাট্টা করেনি। সব ছেলেরা খেলতে যেতো, সে মাথায় ছাতা ধরে ছায়ায় বসে খেলা দেখতো। বলতো—নতুন রোদ, বুঝিস না ত', সানষ্ট্রোক লেগে যেতে কতক্ষণ?

বৃষ্টি পড়লে বাদলের গায়ে সোয়েটার, পায়ে গরম মোজা উঠতো সঙ্গে সঙ্গে। বন্ধুবান্ধব ঠাট্টা করতো। বাদল নির্বিকার। বলতো—ভিজছিস ত' শখ করে, জানিস না, এই সময়কার বৃষ্টিটা কি আন্দাজ ক্ষতি করে! বে-কায়দায় একবার ঠাণ্ডা লেগেছে কি মরেছিস। ইনফ্লুয়েঞ্জা তোর হবেই হবে।

শেষ অবধি হিমাদ্রিদের দল তাকে নন্দলাল নাম দিল। বললো—'সকলে কহিল, ভ্যালা রে নন্দ, বেঁচে থাক্ চিরকাল।'

আর কিছুদিন বেঁচে বাদলকে সংসারী করে, তাঁরই মত জবরদস্ত কোন শ্বশুরের জিম্মায় তার ইহকালের ভাবনা-চিন্তা সুরক্ষিত করে রাখবার ইচ্ছা ছিল সুরেশ্বরের। ইদানীং তাই, ঘটক সঙ্গে নিয়ে তিনি বেছে বেছে সেই সব পাত্রীদের খোঁজ করছিলেন, যারা বিত্তশালী পিতার একমাত্র কন্যা। বিত্তটার খুব প্রয়োজন নেই তাঁর। তবে ওটা না হলে শ্বশুরের চরিত্রেই বা কর্মক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি আসবে কোথা থেকে! যে রকম সচেষ্ট হয়েছিলেন, তাতে অচিরে শুভকর্মটি ঘটে যেতেও পারতো। তবে ঐখানে সুরেশ্বরের ভাগ্য আর একবার

মুচকি হাসি হাসলেন। আলগোছে টুপ করে সরিয়ে নিলেন তাঁকে। ইদানীং সুরেশ্বর সংসার এবং জীবনকে উদ্যানের সঙ্গে তুলনা করে প্রায়ই তাঁর অ্যাটর্নিকে বলতেন—বুঝেছ রমেন? সবই করেছি—গাছ বুনেছি—ফল ফলেছে, এখন শেষ কুড়োতে পারলেই হয়!

দেখা গেল শেষটি কুড়োবার ভাগ্য তাঁর হলো না। তার বদলে ময়নাডালের বিখ্যাত কীর্তন-সমিতি খোল-করতাল বাজিয়ে তাঁর দেহটাকে পৌঁছে দিয়ে এল শ্মশানঘাটে। সেই গুরুদেব সেদিনও বাদলের পিঠ থাপড়ে তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন। বাদল শোকাভিভূত হবার চেয়ে সন্ত্রস্ত হচ্ছিল বেশি। তার মনে হচ্ছিল, ঐ যে অবহেলায় সুরেশ্বরকে ওরা নাড়াচাড়া করছে, যে-কোন মুহূর্তে সুরেশ্বর হুমকি দিয়ে উঠবেন। বলবেন—খবরদার!

এই রকমই ছিলো সুরেশ্বরের ব্যক্তিত্ব।

মৃত্যুর পরে সুরেশ্বর দেয়ালে চন্দনের ফোঁটা সম্বলিত একখানা ছবি মাত্র হয়ে গেলেন। আর অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে বাদল প্রথমটা বিভ্রান্ত হয়ে গেল। ডেথ ডিউটি দেবার পরেও যা রইলো, তা বাদলের পক্ষে যথেষ্ট।

সে যে স্বাধীন এবং মাথার ওপরে যে সর্বশক্তিমান সুরেশ্বর বসে তার সকালবেলা ত্রিফলার জল, দুপুরের মাগুরমাছের ঝোল এবং তার বাইরেও সমস্ত জীবনটা নিয়ন্ত্রণ করতেন—তিনি আর নেই, এটা বুঝতেই বেশ কিছুদিন গেল।

বাদল বন্ধুবৎসলতার জন্যে বন্ধুদের বিশেষ প্রিয় ছিল। এখন হিমাদ্রি, শঙ্কর, সুপ্রিয় সবাই একত্র হলো। আর্টিস্ট রঞ্জন বললো—সালোঁ খুলে দে বাড়িতে। নিজে ত' কিছু করবি না। ভেবে দেখেছিস কখনো? শুধু একটু জায়গা, একটা স্টুডিওর অভাবে আমি কি হতে পারতাম, অথচ কি হতে পারছি না?

শঙ্কর রাজনীতি করে, এবং যুক্তিবাদী বলে তাকে সকলে ভয় করে। সে হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে সেদিকে চেয়ে বললো—

বাদল, আজকাল সব কিছুই ব্যবহারিক মূল্য দিয়ে বিচার করবার দিন এসেছে, মান ত'? তুমি দীর্ঘদিন, বলতে গেলে চিরদিনই, নিজের কথা ভেবেছ, কোনদিনও পরের কথা ভাবনি। তাই, এখন তুমি ইচ্ছা করলে জীবনের ধারা খানিকটা বদলাতে পার।

সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয় বললো—তার·মানে, তুমি এখনি রীতার সেই পলিটিক্সের ক্লাসের কথা বলবে।

শঙ্কর অসন্তুষ্ট হলো। বললো—সুপ্রিয়, মিস চৌধুরী সম্পর্কে তুমি ও রকম সুরে কথা না বললে খুশি হব।

—মিস চৌধুরী?

—রীতা চৌধুরী।

—রীতা, চৌধুরী নাকি? কি জানি, এতদিন ধরে দেখছি, ভুলেই যাই, ওর পুরো নামটা কি!

—ঐ দেখেছ পর্যন্ত, আর কিছুই চেননি।

—কি, আমি ওকে চিনি না, তাই বলেছে নাকি রীতা?

—তুমি ওঁকে চেননি, আমি তাই বলছি।

—তুমিও ছাই চিনেছ—যদি জানতে…যাক্ গে!

রীতার প্রসঙ্গ তুলে শঙ্করের এই জ্ঞানগম্ভীর ভাবটা ভেঙে দিতে বরাবরই মজা পায় সুপ্রিয়। এখনও সে হাসিমুখে চেয়ে রইল। তারপর এক লাফে চেয়ার টপ্‌কে বাদলের ইজিচেয়ারের হাতলে এসে বসলো। বললো—কিচ্ছু না বাদল, তুমি আমাদের লনটা ছেড়ে দাও। একটা টিনের শেড তুলি। নীচের হলঘরটা থেকে চিড়িয়াখানা সরিয়ে ফেল। আমার ক্লাবটা ঘর খুঁজে খুঁজে মরে গেল। ঘরটায় রিহার্সাল দেব, আর শেডে মাদুর বিছিয়ে লোককে শো দেখাব।

—কেউ দেখবে না।

শঙ্করের চেয়ে সুপ্রিয়র গায়ের জোর অনেক বেশি। ইচ্ছা থাকলেও শঙ্কর চেঁচিয়ে পারবে না। সুপ্রিয় তার কথা গায়েই মাখল না। বললো—যাত্রা, যাত্রার দিকে ফিরে যেতে হবে।

আমাদের দেশে যা ছিলো এবং যার প্রয়োজনীয়তা ইদানীং সবাই বলছেন। মানুষকে স্টেজে ডেকে নিয়ে গেলে হবে না—মানুষের মধ্যেই তাকে পৌঁছে দিতে হবে।

যে বাদলের কোনরকম ব্যক্তিত্ব আছে বলে এরা কোনদিন স্বীকার করেনি এবং নিজেদের এই সব মূল্যবান আলোচনার সময়ে বড়জোর তাকে শুধু চা-খাবার খাওয়াবার অধিকারটুকু দিয়েছে—সেই বাদল আজ এদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে অনেকখানি। দেখে বাদলের মধ্যেও একটা আত্মপ্রসাদ বিস্তৃত হতে থাকলো। সে বললো—আহা, না হয় খুলবেই ক্লাব। তোমাদের এতটুকু উপকারও কি আমি করতে পারি না? তবে টিনের শেড তুলে আর লনটা নষ্ট করো না। বাবা বার্মা থেকে সাদা ঘাস আনিয়ে লনটা তৈরি করেছিলেন। খরচ পড়েছিলো বিস্তর।

সবাই উঠে পড়তে হিমাদ্রিকে হাত চেপে ধরে বসালো বাদল। বললো—অনেকদিন এত কথা বলা বা শুনা অভ্যাস নেই ত', শরীরটা কেমন যেন লাগছে। হয়তো বেশি স্ট্রেইন করে ফেললাম। একটু দেখবে?

হিমাদ্রি বললো—ওটাও তোমার ঐ সাদা ঘাসের মত একটা বিলাসিতা বাদল। আসলে তোমার কোন অসুখই নেই। মনটাকে শক্ত করতে পার না?

—বুঝতে পারছ না হিমাদ্রি, চট করে কি একটা নতুন জীবনে অভ্যস্ত হতে পারি?

—বেশ, কাল চেম্বারে এসো। দেখবো এখন।

সুরেশ্বরের শিকারী-জীবনের স্মৃতি-বিজড়িত স্টাফ-করা বাঘের মাথা, হরিণের শিঙ আর ভালুকের চামড়া সরিয়ে ফেলে হলঘরে ক্লাব খুলে ফেলেই ক্ষান্ত হলো না সুপ্রিয়। সে বাদলকেও টেনে আনলো সেখানে। বাদল বললো—নাটকের আমি কি বুঝি?

কিন্তু সুপ্রিয়র আবিষ্কার শীলা সোম আর লীলা সুখটঙ্কর হাত জড়িয়ে ধরলো বাদলের। লীলা সুখটঙ্করের চোখ দুটোই নাকি এক

আশ্চর্য আকর্ষণ। সে চোখের পাতা কাঁপিয়ে মিঠে বাংলায় বললো —তা হবে না, তোমাকে আসতেই হবে।

বাদলের মন্দ লাগল না। অনেকদিন হিসেব করে করে বেঁচে হঠাৎ এই সব সুন্দর সুন্দর মেয়ের কাছে এতটা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠবার অনুভূতিতে প্রথমটা গা ভাসিয়ে দিল সে।

সুপ্রিয়র প্রচেষ্টা যদি এতই মহৎ হয়, তবে তার মধ্যে জ্ঞানী গুণী উপদেষ্টা হিসেবে শঙ্কর ও রীতারও থাকা উচিত—এই মনে করে সে শঙ্করের ঘরেও টোকা মেরে দেখলো। কিন্তু সে ঘরে বসে তখন শঙ্কর আর রীতা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। শঙ্কর বিরক্তভাবেই বাদলকে বললো—কিছু হচ্ছে না। এতদিন ভেবেছিলাম রীতা অনেক কিছু করতে চায়—একটু জায়গা, একটু নিরিবিলি কোণের অভাবে ওর কোন কাজ এগোচ্ছে না। এখন দেখছি মেয়েদের চেনা যায় না।

—কি হলো ? ভয়ে ভয়ে বাদল বললো।

শঙ্কর বললো—নিজে সব ভুলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, আমিও স্বভাবতই ওকেই দেখতে শুরু করেছি। বুঝতে পারছ না, কি রকম অসুবিধায় পড়েছি।

—অসুবিধে ? কিসের অসুবিধে ?

—অসুবিধে নয় ? এখানে এসে যতক্ষণ না রীতাকে দেখছি ততক্ষণ অন্য কোন কাজ করতে পারছি না। অথচ এই যে মনের অবস্থা, এ-ও ত' একটা দুর্বলতা। দেখেও শান্তি নেই, আরো দেখতে ইচ্ছে করে। এ তুমি বুঝবে না বাদল !

—আমার মনে হয় শঙ্কর, এর থেকে তোমাদের সম্পর্কটা অন্যরকম দাঁড়িয়ে যাবে।

—দাঁড়িয়ে যাবে কি বলছো ? এখনই কি দাঁড়ায় নি ? তুমি যাও বাদল, আমায় বিরক্ত করো না। কি করে কি হলো, তার একটা বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণ করতে হবে ত'। আমি ব্যস্ত আছি।

সুপ্রিয় শুনে বললো—ও হলো বিশ্লেষণধর্মী মনের ব্যাপার। প্রেমে পড়ছে কি না, এবং তার সূত্র কোথায়, উৎস কোথায়, সে সবও ত' চুলচেরা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে নিজেকে। শঙ্কর আর রীতার কথা বলো না। ওসব ভেব না বাদল, তুমি আমাদের মধ্যে এসো।

যেটুকু বা সঙ্কোচ ছিল বাদলের, শীলা এবং লীলা দুই হাত ধরে তাকে টেনে, সে সঙ্কোচের বেড়া পেরিয়ে নিয়ে গেল। তাদের সংস্পর্শে আগে আসেনি বাদল। এখন যতই দেখলো, ততই মুগ্ধ হলো।

যা দেখে, তাই-ই অপূর্ব লাগে শীলা ও লীলার। কি অপূর্ব, এ ছাড়া কথা নেই মুখে। আর কখন যে কোন্ জিনিসটা অপূর্ব লাগবে, তা বুঝতে বাদলের অনেক কসরৎ করতে হলো—এবং তাতেও থই না পেয়ে সে হাল ছেড়ে দিল।

দেখা গেল, ধর্মতলায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফলের রস খেতে তাদের অপূর্ব লাগছে। নাইলনের আঁচল মাটিতে লুটিয়ে তারা হাসতে হাসতে আখের রস খাচ্ছে, এই দেখে বাদল ভাবলো, কি সরল এদের মন। কত সহজে এরা খুশি হয়।

পরদিন দেখা গেল দোকানে ঘুরে দেশী বিদেশী সুগন্ধির শিশি, রুমাল বা ব্যাগ কিনতেও তাদের সমান ভাল লাগছে। দাম দিয়েই বাদল ধন্য হলো।

কোনদিন বা কিচ্ছু না করে শুধু গান গাইতে অপূর্ব লাগলো, গঙ্গার ধারে গাড়ি থামিয়ে।

সুপ্রিয় বললো—কি শুরু করলে বাদলকে নিয়ে?

লালা চোখ ছোট করে বললো—জীবনটা একটু চিনিয়ে দিচ্ছি। কি বাদল, ভালো লাগছে না?

বাদলের মনে হলো, এমন প্রশ্ন কেউ করে? তার চমৎকার লাগছে।

সে অভিনয়ে গান গাইবার জন্য ডাক পড়েছিলো প্রতিমার। সুপ্রিয়ই কথাচ্ছলে বলেছিলো—বেবি ত' গীতশ্রী না কী হয়ে বসে

আছে! ধার দাও না হিমাদ্রি বোনটিকে—মাত্র কয়েকদিনের জন্যে। ভয় নেই, বোনকে আমরা হুজুগের মধ্যে টানছি না।

হিমাদ্রি তার বোনের বিষয়ে একটু রক্ষণশীল। মা বাবা নেই—নিজে ডাক্তার মানুষ, পাস করে বেরিয়ে বিলেত যেতে পারল না, আর আজকাল একটু বাইরে থেকে ঘুরে না এলে তার পেশাতে প্রতিষ্ঠা পাওয়া বেশ কঠিন। প্রতিমাকে ছোটবেলা থেকেই সংসারটার ভার নিতে হয়েছে। প্রতিমা যেমন লাজুক, তেমনি মুখচোরা। হিমাদ্রির মনে মনে এ ভয়ও আছে, প্রতিমা যেরকম সহজেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, এ সব জায়গায় এলে সে বিব্রত হয়ে পড়বে। আর প্রতিমাকে নিয়ে কেউ যদি হাসি-ঠাট্টা করে, এইসব মেয়েদের মধ্যেই কেউ—তাহলে হিমাদ্রির ভালো লাগবে না। এমনিতে সে মোটা দাগের মানুষ। মানুষকে মুখের ওপর রূঢ় কথা শোনাতে তার বাধে না। ঐ একটা জায়গায় হিমাদ্রির মনটা স্নেহদুর্বল। সে বাদলকে বললে—আমি ত' সন্ধ্যাবেলা সময় পাব না। তুমি যদি ক'দিন তাকে নিয়ে আসো আর পৌঁছে দেবার ভার নাও ত' আমার আপত্তি নেই।

সুপ্রিয়র নাটকে বাদলের ভূমিকা খানিকটা ঐ পর্যন্তই। তার যখন গাড়ি আছে, তখন মেয়েদের আনবার ও পৌঁছে দেবার ভারটুকুও তারই নেওয়া উচিত।

বাদলের নাটকে প্রত্যক্ষ যে ভূমিকাটুকু ছিল, সেটা নেহাৎই নগণ্য। তাই প্রতিমা যখন একদিন বললো—সুপ্রিয়দা আপনাকে অত শুধরে দেয় কেন? আপনি ত' চমৎকার করেন।

বাদল আশ্চর্য হয়ে বললো—ভালো লাগল তোমার?

—কেন, আপনার অভিনয় আমার খুব ভাল লাগে—দাদাকে বলেছি ত'!

—কই হিমাদ্রি, তুমি ত' আমায় বল নি।

হিমাদ্রি বলেছিল—বাদল ইচ্ছে করলে ভালই করতে পারে—

তবে গলা নিয়ে যা ভয়। ওকে ত' জান না বেবি। অভিনয় করবে, তাও গলা চেপে—পাছে গলার কোন ক্ষতি হয়।

প্রতিমা আশ্চর্য হয়ে বলেছিল—দাদা আপনাকে এত ঠাট্টা কেন করে বাদলদা? সত্যিই কি আপনি অসুখকে এত ভয় পান?

—কে বললো! বাদল অস্বীকার করেছিলো।

প্রতিমা আরো বলেছিল—সত্যি, আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা করলে আমার এতটুকু ভাল লাগে না। ভারী খারাপ লাগে। ওদের ত' কিছু বলতে পারি না।

এতগুলো কথা বলে ফেলে প্রতিমা লজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। বাদলের খুব ভালো লেগেছিল কথাটা শুনে।

কিন্তু অভিনয়ের পরদিনই গলায় মাফলার জড়িয়ে বাদল হিমাদ্রির বাড়িতে এসে হানা দিল। বললো—আমার গলার ভেতরটায় চিরে গিয়েছে।

হিমাদ্রি বললো—কিছু হয় নি—চেঁচিয়েছ আর সিগারেট খেয়েছ, তাই গলাটা ব্যথা হয়েছে। একটু গরম জল লাগাও, সেরে যাবে।

বাদল প্রায় ভেঙে পড়লো, বললো—শীলা বলছিলো এর থেকে গলায় ক্যানসার দাঁড়াতে পারে। হিমাদ্রি, তুমি দেখ ভাল করে।

হিমাদ্রি বিরক্ত হয়ে বলেছিলো—সর্বদা আমরা কত রকম অসুখের বীজাণুর আওতায় ঘুরছি জান? তোমার হাঁটু অবধি প্লেগের বীজাণু আসতে পারে। কুষ্ঠ হতে পারে কোনমতে রক্তের সঙ্গে ছোঁয়াচ লাগলে। নিশ্বাসের সঙ্গে, প্রতিটি নিশ্বাসের সঙ্গে তুমি টি. বি.-র সম্ভাবনা ভেতরে নিচ্ছ। তারপরে আর যা যা আছে, না-ই বা বললাম।

শুনতে শুনতে বাদল সত্যিই নার্ভাস হয়ে গেল। বললো—তাহলে এর থেকেই যে গলায় ক্যানসার বা অন্য কিছু হবে না, তাই বা কে বলতে পারে?

হিমাদ্রি নাচার হয়ে তাকে চেয়ারে বসালো। গলাটা দেখলো। বললো—পেইন্ট একটা লিখে দিচ্ছি, লাগাও—কিন্তু বাদল, এ কি?

কথায় কথায় যদি নার্ভাস হয়ে পড়, জীবনে কি করে কি করবে বলো! আমার কাজ আছে, আমি বেরুচ্ছি। প্রতিমা, এই বুড়ো-খোকাটির গলায় একটু পেইণ্ট লাগিয়ে দিস্ ত'। স্টেজে দাঁড়িয়ে পনেরো মিনিট চেঁচিয়ে উনি গলায় নাকি ক্যানসার বাধিয়ে এসেছেন! সত্যি বাদল, যা মনে করো, তাই যদি হতো, তাহলে আর আমাদের বিলেতের দিকে চেয়ে বসে থাকতে হতো না। এখানে বসেই ঢালাও রোজগার হতো এই হতভাগা ডাক্তারদের।

প্রতিমাও দাদার কাছে কম ডাক্তারী শেখেনি। গলায় পেইণ্ট লাগিয়ে বললো—চুপ করে বসে থাকুন। কেন একটুতে অমন করেন বলুন ত'? সেইজন্যই দাদা অমন করে বলতে সুযোগ পায়। অথচ সত্যিই ত' আর আপনি ওরকম নার্ভাস নন।

কথা না বলে, পেইণ্টের ঝাঁজ গলায় আস্বাদ করতে করতে বাদল প্রতিমার কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করলো। সে বললো—তুমি আমায় খানিকটা বুঝতে পার। ওরা বোঝে না কিনা!

কি বলতে গিয়ে প্রতিমা থেমে গেল। মনে মনে লজ্জা পেয়ে ঈষৎ হাসল। কথা সে-ও বেশি বলতে পারে না। বাদলের মধ্যে সে এমন কিছু দেখেছে, একটা অসহায় ভাব—যা তার মনকে স্পর্শ করেছে। তার মনে হয়েছে, মানুষটাকে কেউ বুঝতে চায় না—সবাই শুধু তাকে নানাভাবে কাজে লাগাতে চায়। কিন্তু তার মনোভাব পাছে বাদল জেনে ফেলে, সেজন্যে তার সতর্কতা কম নয়। কিছুক্ষণ বাদে সে বললো—আপনার অভিনয় কাল চমৎকার হয়েছিল।

বাদল বললো—তুমিও ত' চমৎকার গাইলে। সত্যি, তোমার গানের গলাটা ভারী মিষ্টি। বাইরে গাও না কেন বল ত'? হিমাদ্রি পছন্দ করে না বুঝি?

—তা নয়। তবে দাদার এদিকে খেয়ালই নেই। আর বাড়িতে কতটুকুই বা থাকে। ব্যস্ত মানুষ। আমি না দেখলে তো চলে না।

বলে প্রতিমা মিষ্টি করে হাসলো। আর আজ বাড়ি ফিরতে ফিরতে বাদলের মনে হলো—প্রতিমার হাসিটি বেশ! দেখতে সে হয়তো অতি সাধারণ, কিন্তু সবশুদ্ধ একটা শান্ত ভাব আছে।

প্রতিমার চোখে বিশেষ হয়ে ওঠবার একটা ইচ্ছে যে তার মনের অবচেতনে কাজ করছে, তা বাদল বুঝতে পারেনি। খানিকটা না বুঝেই দলবল নিয়ে পুরী এবং চিল্কা বেড়াবার প্রোগ্রামে সে রাজী হয়ে গেল। প্রথমটা কথা শুরু হয়েছিলো খেলাচ্ছলে। লীলা সুখটঙ্কর বলেছিলো—চিল্কায় পাখী শিকার আর পুরীতে মুনলাইট পিকনিক—লাভ্‌লি! যাবে বাদল?

—গেলেই হয়।

খুব হালকা ভাবেই কথাটা বলেছিলো বাদল। কিন্তু যাদের কিছু করবার নেই, কোন কাজ করবার প্রয়োজন নেই, আজ নাটক আর কাল আর্ট একজিবিশনে, এটার থেকে ওটাতে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বাঁচাই যাদের কাজ, তাদের মাথায় যে সব সময় নতুন কিছু একটা করবার ক্ষ্যাপামি ঘুরছে, এবং সেখানে এই ধরনের প্রস্তাবের একটি ছোট্ট ঢিল ফেললেই যে মস্ত একটা আবর্তের সৃষ্টি হবে, তা বাদল বুঝতে পারেনি।

হঠাৎ সে শুনতে পেল, সে নাকি শীলা এবং লীলার সহযোগিতায় শিকার ও এক্সকারশানের একটা দল নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে। হিমাদ্রি বলে গেল—খুব ভালো। এই ধরনের উৎসাহই ত' চাই বাদল। তোমার মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। খুব আনন্দের কথা।

বাদল শুনে চালাকের মত হাসলো। নিজে নিজে কিন্তু ভেবে-চিন্তে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। সে কখন শিকার-পার্টিতে যাবার কথা বললো? মনে পড়ছে না ত'? নিশ্চয় শীলারা ঠাট্টা করেছে।

কিন্তু অভূতপূর্ব নাটকের অসাফল্যের পর তখন আর সুপ্রিয় নাটকের কথাকে আমল দিতেই প্রস্তুত নয়। তার তখন মনে হচ্ছে,

এখন বেরিয়ে পড়ে খানিকটা হৈ-চৈ না করলে এই অবসাদ কাটানো যাবে না। সে শীলা আর লীলাকে ভার দিল শিকার-পার্টিতে কি লাগবে না লাগবে তার ফর্দ বানাতে।

শীলা ও লীলা খাতায় লম্বা লম্বা লিস্ট লিখে বসেছিল। বাদলকে বললো—বাদল, তোমার কথামত সব তৈরি করেছি। তবে পনেরো জনের পার্টি, তুমি শুধু খাওয়া-দাওয়ার ভারটা নাও। ঐ কয়জন চাকরবাকর, আর কি কি লাগে যেন? ডেক্‌চি···পেয়ালা···এমন করে উচ্চারণ করলো শীলা, যেন স্প্যানিশ বা ডাচ, কোন বিদেশী ভাষা বলছে।

সুপ্রিয় বললো- বাঃ, তোমরা রাঁধবে না?

—নিশ্চয়। সব রকম টিনের জিনিস নিয়ে চলো—লাভ্‌লি মেয়োনাইজ আর স্যাণ্ডউইচ খাওয়াব। অলিভ নিতে ভুলো না কিন্তু! কি চমৎকার লাঞ্চ খাওয়াব দেখো।

মুভি ক্যামেরা, সিল্কের তাঁবু, বাক্স, বিছানা সবসমেত তিনখানা গাড়িতে বাদলদের পার্টি রওনা হলো। শেষ অবধি বাদল হিমাদ্রি আর প্রতিমাকে সঙ্গে নিলো। হিমাদ্রি বললো, আমি কাজকর্ম নষ্ট করে চিল্কায় বসে কি করব?

—তুমি আমাদের মেডিক্যাল অফিসার হয়ে চলো।

—প্রতিমাকে একলা রেখে যাব?

—তা, ওকেও নিয়ে চলো।

প্রতিমাও চললো দেখে শীলা এবং লীলা অবশ্য সুপ্রিয়কে শোনাতে ছাড়ল না—বাদল নাগের যাই বলো, রুচি নেই। কি দেখলো ওই মেয়েটার মধ্যে বল তো?

—আহা, বেবিকে নিজেদের প্রতিযোগী মনে করছ কেন?

—কি? আমরা!

সমস্বরে প্রতিবাদ করলো দুজন। আর প্রতিমার সম্পর্কে তাদের ঈর্ষা আছে, একথা যদি ঘুণাক্ষরেও ভেবে থাকে সুপ্রিয়,

তাই প্রতিমার সঙ্গে বিশেষ করে তারা বন্ধুত্ব করতে চেষ্টা করলো।

তাদের কথা শুনতে শুনতে প্রতিমার নিজেকে বড়ই ছোট মনে হলো। সে শিকার করেনি। শীলার মত নৈনীতালে মাছ ধরবার কম্পিটিশনে প্রথম হয়ে গভর্নরের হাত থেকে মেডেল নেয়নি। লীলার মত ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে উড়ন্ত হাঁস টিপ করে মাটিতে ফেলেনি। লীলা বললো—আপনার তাহলে কি ধরনের স্পোর্টে আগ্রহ ?

বলতে গিয়ে প্রতিমা জবাব দিতে পারল না। তখন শীলা আর লীলা হঠাৎ উঁচু সরু গলায় ইংরেজী গান গাইতে শুরু করলো।

তাতে প্রতিমার আরো বিব্রত লাগলো।

দেখে বাদলের কষ্ট হলো। পথে এক জায়গায় নেমে চা খাবার পর বাদল তাকে নিয়ে অন্য গাড়িতে গেল। বললো—আরাম করে বসো। বরঞ্চ একটা গান গাইতে চেষ্টা করো। যত রাজ্যের বাজে কথা! কি হবে মাছ ধরে আর পাখী মেরে ? যেমন শীলা আর লীলা, তেমনি সুপ্রিয়। ওরা সবাই পাগল।

প্রতিমার খুব ভাল লাগছিল। সে চিরদিনই বাড়িতে থেকেছে। বাইরে যা দেখছিলো, তাই তার সুন্দর লাগছিলো।

চিল্কাতে পৌঁছে বাদল কেমন করে যেন একটা পাখী শিকার করে ফেললো। তাতে পাখীটা এবং সে তু'জনেই যুগপৎ বিস্মিত হয়েছিলো। সকলে বেরিয়েছিলো জল-কাদা ভেঙে, কাঁধে ব্যাগ নিয়ে। প্রতিমা বলেছিলো, শিকার আমি দেখতে পারি না। আমার কষ্ট হয়। তার চেয়ে আমি ডাকবাংলোতেই থাকি।

বাদল হাত নেড়ে বলেছিলো—রান্নাবান্না দেখতে যেও না যেন শিকার মানে শিকারের মাংস খাওয়া। একা লীলাই ত' আমাদের সকলকে টেক্কা দেবে, কি বল লীলা ? লীলা শিকার করে আনবে আর সেই মাংস রান্না হবে।

লীলা এবং শীলা ব্রিচেস পরে মাথায় সিল্কের স্কার্ফ বেঁধে সকলের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিল্কার দিকে চেয়ে প্রতিমার মনে হলো, এমনি সুন্দর সকালে হৈ-হৈ করে শিকার করবার কোন মানে হয়? দাঁড়িয়ে দেখতে যখন এত ভালো লাগে!

শিকারের ব্যাপারে নাকি ভাগ্যটাই সব। বাঘ দেখবার আশায় বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরেও দর্শন মেলে না। আবার হঠাৎ বন্দুকের সামনে বাঘ মিলে যায় অদ্ভুতভাবে।

এবার ভাগ্য শুধুই পরিহাস করলো শিকারীদের সঙ্গে। সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে অজস্র গুলি খরচ করে, হাঁটু অবধি কাদা মেখে নিরাশ হয়ে সবাই যখন ফিরে আসছে, বাদল নেহাৎ তিতিবিরক্ত হয়ে 'দুত্তোর শিকারে নিকুচি করেছে' বলে সামনের ঘাস-ঝোপে গুলি ছুঁড়ে বসলো। সকাল থেকে লীলা শুধু লেকচার দিয়েছে কি ভাবে বন্দুক ধরতে হয়, কি ভাবে টিপ করতে হয়···দু' একবার পাখী যদি বা সামনে পড়েছে, লীলার লেকচার শুনে তারা উড়ে গিয়েছে।

এবারও লীলা সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিলো—কি করছো বাদল, অমনি করে বন্দুক ধরে! তারপর লীলার মুখের কথা মুখেই রইলো, কেন না বাদল যদিও ফাঁকা জায়গা দেখে নেহাৎ খেলাচ্ছলেই মেরেছিলো গুলিটা, একটা পাখী তাতে গড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে চীৎকার করে বন্দুকটা মাটিতে ফেলে ছুটে গিয়ে হাঁটুজলে বুক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাদল পাখীটা তুলে আনলো। আর সকলের মুখে কথা থেমে গেল। বাদল ঠ্যাংটা তুলে পাখীটা দেখিয়ে বললো—লীলা, তুমি রাইফেল ক্লাবে অনেক শিখেছ, অনেক জেনেছ, কিন্তু যে শটে পাখী পড়ে, সেই একটা শট তুমি জান না। ওটা আমার কাছে শিখে নিও। অন্য যেগুলো জান, সেগুলো কি রকম অকেজো দেখলে ত?

লীলা বললো—ওটা অ্যাক্সিডেন্ট।

এই প্রথম শঙ্কর এবং রীতা যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে বাদল বা লীলাকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করলো না। শঙ্কর বললো---হোক অ্যাক্সিডেণ্ট তবু বাদল আমাদের মুখ রেখেছে।

প্রতিমা এত খুশি হলো যে, প্রকাশ্যেই বলে ফেললে—আমি জানতাম!

বাদল রণক্লান্ত বিজয়ী সেনাপতির মতই পা ছড়িয়ে বসে আজ প্রতিমার স্তুতি গ্রহণ করলো। এমন কি, পা যেখানে ছড়ে গিয়েছিল, সেখানে প্রতিমা যখন আয়োডিন পেনসিল বুলিয়ে দিল, তখন সে এমন কথাও বললো—কেন ব্যস্ত হচ্ছ প্রতিমা? এমন কত হয়। বাইরে বেরিয়ে কি আর এসব মনে রাখলে চলে?

এই শিকার পার্টিতে প্রতিমারও যে ভূমিকা ছিলো একটা, তার দাম বোঝা গেল এই সময়। ঈষৎ সলজ্জ হেসে সে জানালো, জেলেরা মাছ নিয়ে যাচ্ছিল। বেলা হচ্ছে দেখে সে মাছ কিনেছে। রান্নার ব্যবস্থা করেছে। সে ত' জানে না বাদলদের ফিরতে এত দেরি হবে। শিকারের মাংসের জন্যে সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল।

সুপ্রিয় বললো—ঠিক করেছ, কাজের কাজ করেছ। দেখছ ত' শীলা, মাছ ধরবার কম্পিটিশনে না নেমেও বেবি কেমন তোমাকে হারিয়ে দিল! এবার গিয়ে একটু রান্নাবান্না শিখো।

শীলা আর লীলা রেগে অন্য ঘরে গিয়ে গ্রামোফোন বাজাতে বসলো।

চলে আসবার আগে বাদল বললো—প্রতিমা, তোমাকে ত' কেউ দেখাল না। চলো, চিল্কার পাড়ে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখবে। না দেখেই চলে যাবে?

চিল্কার পাড়ে দাঁড়িয়ে সে অগাধ, অতলান্ত জলরাশি দেখতে দেখতে প্রতিমা বললো—আচ্ছা, জল কি সত্যিই নীল? এমন নীল দেখায় কেন?

এই মেয়েটির সংস্পর্শে এলে বাদলের কেন যেন নিজেকে শক্তিশালী মনে হয়। ভাল ভাল কথা মনে আসে তার। একটু

ভেবে সে বলে ফেলল—ঐ নীলটা কি জলে আছে প্রতিমা? আমাদের চোখে আছে। তাই আমি তুমি ওকে নীল দেখছি।

তা কি হয়?

কেন হবে না? তোমার চোখকে আমার এক এক সময় মনে হয় পুকুরের জলের মত টল্‌টলে ছল্‌ছলে কালো। অথচ সত্যিই ত' তা নয়! ওটা আমার চোখ দিয়ে আমি যেমন দেখছি তাই।

প্রতিমা চুপ করে গেল। তার চোখ নিয়ে এমন কথা, বাদল কেন, কেউই বলেনি। তার খুব ভালো লাগল। বাঁদলের মনে হলো, সে খুব সুন্দর একটা কথা সাজিয়ে বলতে পেরেছে। সে মুখ নীচু করে প্রতিমার দিকে চেয়ে হাসলো। আর আজ, বাদলের সারাদিনের পরিশ্রমে উস্কোখুস্কো চুল, লাল মুখ, চিন্তার ছায়া ধরে প্রসন্ন গভীর চোখ, সব দেখে প্রতিমার মনে হলো, সত্যিই বাদলও খুব ভালো লাগবার মত মানুষ। তাকে বুঝতে পারে না বলেই বন্ধুরা এমন করে পরিহাস করে।

একটি মেয়ের চোখের নীরব স্তুতি একটি ছেলেকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হতে যে কেমন করে সাহায্য করে, একজনের সামনে নিজেকে কৃতী বলে জাহির করবার কি যে প্রেরণা জোগায়, তা জানত না বাদল।

পুরীর সে চন্দ্রালোকে পিকনিকে—বালির ওপর বসে প্রতিমার গানে গানে সুন্দর হয়েছিল সন্ধ্যা।

শীলা এবং লীলা দু'জনেই খানিকটা নিষ্প্রভ মনে করেছিলো নিজেদের। আর যাই হোক, অমন গানের গলা তাদের নেই। ভারতীয় সঙ্গীত তারা সবিশেষ বোঝে না। কেমন যেন মনে হচ্ছিল, শ্যামবর্ণ ঐ অতিসাধারণ চুপচাপ মেয়েটির কাছে তারা হেরে যাচ্ছে। সুপ্রিয় অবধি চোখ বুজে চিৎ হয়ে পড়ে আছে, আর ফরমাস করছে,

—এটা নয়, ঐ গানটা গাও বেবি। চমৎকার লাগছে। কি সুন্দর গলা হয়েছে তোমার।

গান থামতে হঠাৎ শীলা প্রস্তাব করলো—এসো, স্নান করা যাক।

এই রাতে? অবাক করলে শীলা।

কেন সুপ্রিয়? রাতে ত' সমুদ্রে স্নান করনি? চমৎকার লাগবে।

বাদল হঠাৎ সকলের চেয়ে উৎসাহী হয়ে উঠলো। বললো—এসো। চমৎকার প্রস্তাব। সত্যি, রাতে স্নান না করলে একটা অভিজ্ঞতাই বাদ থেকে যাবে।

সকলেই নামলো জলে। ঝাঁপাঝাঁপি করে স্নান করতে করতে বাদল বোধহয় একটু দূরে গিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তার মনে হলো পায়ের নীচে কি জড়িয়ে যাচ্ছে। নরম, অস্থিহীন একটা মাংসপিণ্ড যেন। সঙ্গে সঙ্গেই যুক্তিহীন নিদারুণ আতঙ্কে সে চেঁচিয়ে পালিয়ে আসতে চাইলো। কিন্তু তখন মাথার ওপর বড় ঢেউ। মাথা নীচু না করে উপায় নেই। মাথা নীচু করে চোখ বুজল বাদল, আর স্পষ্ট বুঝতে পারল সেই অস্থিহীন মাংসপিণ্ডটা তার গা দিয়ে পিঠ দিয়ে স্পর্শ করে জড়িয়ে জড়িয়ে জলে নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর জ্বলে গেল তার।

আতঙ্কে যুক্তি হারিয়ে বাদল কোনমতে জল থেকে উঠল। তারপর ছুটতে ছুটতে এল হিমাদ্রির নাম ধরে ডেকে।

বড় বাতি জ্বেলে সবাই মিলে দেখলো।

সত্যিই সমস্ত গা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে আর জ্বালায় বাদল দাঁড়াতে পারছে না।

তারপর হৈ-চৈ—বাংলোয় ফিরে হিমাদ্রির চিকিৎসা। বাদলের কষ্ট দেখে প্রতিমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তাড়াতাড়ি যন্ত্রণা কমাবার জন্যে হিমাদ্রি অ্যালার্জির ওষুধ ক্যালসিয়াম ইঞ্জেকশান করলো। সামান্য কমলো মাত্র। প্রশমিত হলো না। রাত না পোহাতেই তারা সদলবলে ফিরে এল কলকাতা।

বাদলের শরীরের লাল দাগগুলো তখন বিশ্রী, কুৎসিৎ একটা কালচে সবুজ রং ধরেছে। বড় বড় ডাক্তারদের এনে পরামর্শ করলো হিমাদ্রি। বম্বে থেকে ডক্টর দেশমুখ কলকাতা হয়ে ব্যাঙ্ককে যাচ্ছিলেন এক কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে। তাঁকে আনলেন ডক্টর সত্যেন সেন। মূল্যবান সব মস্তিষ্ক এক হলো। গভীর পরামর্শ চললো। প্রতিমা রোজ এসে বাদলের পাশে হাত ধরে বসে রইলো। শরীরের সে দাগ এবং যন্ত্রণা দ্রুত কমে এল। তবু প্রতিমার উপস্থিতিটা নেহাৎ প্রয়োজন বলেই মনে হলো।

সবটুকু ট্র্যাজেডি তোলা ছিল উপসংহারের জন্য। শেষ অবধি ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনা করে হিমাদ্রি গম্ভীর হয়ে গেল।

বাদলকে মৃত্যুর পরোয়ানা শুনিয়ে হিমাদ্রি ওপরে এল, তার বোনের কাছে। আশ্চর্য হয়ে প্রতিমা বললো—বাদলদা চলে গেলেন, একবার দেখা করে গেলেন না?

আমি বারণ করেছি।

কেন, দাদা?

শোন বেবি। ছোটবেলার দিনগুলির মত হিমাদ্রি প্রতিমাকে তার কাছে টানলো। বললো—বাদলের একটা ভয়ঙ্কর অসুখ হয়েছে। বুঝলি? পুরীর সে ব্যাপারেই তার সূত্রপাত। ও হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই, আর বছর খানেকের বেশি বাঁচবে না। তুই আর ওর কথা ভাবিস না বেবি। তুই ওকে ভুলে যা।

ভুলে যাবে বাদলকে? দাদার কথা শুনতে শুনতে প্রতিমার মনে হলো, সে ভুলতে পারবে না।

সেই দুঃস্বপ্নের বিনিদ্র রাত পোহালে সূর্যের প্রথম আলোটা পড়লো বাদলের ওষুধের আলমারির ওপর। ছোট একটি আলমারিতে, নানারকম পেটেন্ট ওষুধ সারি সারি সাজানো। বাদলের

দৈনন্দিন জীবনের নিত্যসঙ্গী। সেদিকে চোখ পড়তেই ক্ষেপে গেল বাদল। নিওগ্যাডিন, কেপলার্স মল্ট, ওয়াটারবেরিজ আর স্যাণ্ডোজ ক্যালসিয়াম। মনে হলো ওগুলো নির্জীব ওষুধের শিশি নয়। সজীব কতকগুলো বিদ্রূপ। তাকে করুণা করছে। বাদলের বিছানার পাশে ভোরের হরলিক্স আর ভিটামিন বি-র শিশি রেখে সবে বেরিয়েছে চাকর। ওষুধের শিশিটা তুলে দেখে বাদল চেঁচিয়ে উঠলো —ওঃ ভিটামিন বি এবং ডি একসঙ্গে! একেবারে রাজা করে দেবে আর কি! নিকালো!

বাইরে চাকরের পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে এসে পড়লো শিশিটা। বাদলকে কেউ কোনদিন চেঁচিয়ে কথা বলতে শোনেনি, তাই স্বভাবতই কৌতূহলী হয়ে চাকর ঘরে উঁকি মারলো। তারপরই আর্তনাদ করে সে মুহূর্তে অপসৃত হলো।

বাবুর মাথা খারাপ হয়েছে এবং তিনি বন্দুক নিয়ে বসে আছেন, এ খবর পেয়ে সবাই ওপরে ছুটে আসতে না আসতে বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচভাঙার শব্দ ছড়িয়ে পড়লো।

দরজা বন্ধ, জানালা দিয়ে উঁকি মারতে ভয় করছে, তবু উপায় নেই। দুটো আওয়াজের পর বাদলই দরজা খুললো। বললো, দাঁড়িয়ে কি মজা দেখছ? ঝাঁটা নিয়ে এসো; সাফ করে নিয়ে যাও।

না। অঘটন কিছু হয়নি। বাদলের চোখটা লাল এবং চুল এলোমেলো ঠিকই। তবু হাতে বন্দুক নেই ত'।

দেখা গেল বিছানায় বসে গুলি করে বাদল আলমারিটা এবং ওষুধগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে।

বাদলের জ্ঞাতিপিসিমা বাদলকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন—ওরে নাগবংশে কেউ যে পাগল ছিল না রে!

বাদল তাঁকে ছাড়িয়ে দিয়ে ধমকে বললো—ছিল না? সবাই তোমরা পাগল। সবচেয়ে বড় পাগল ছিল তোমাদের সুরেশ্বর নাগ। যাও, নীচে গিয়ে পার তো চা পাঠিয়ে দাও।

চা? সকালবেলা?

একশোবার চা। আলবৎ চা! চা বোঝ না? না কি আমার কথা বুঝতে তোমার কষ্ট হচ্ছে?

আর ভুল নেই। নির্ঘাত সুরেশ্বর নাগের প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আত্মা ঘরে-দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বাদলের মধ্যে দিয়ে সহসা আত্মপ্রকাশ করছে। বাড়ির সব কয়জন চাকর-বাকরকে নিয়ে পিসিমা চা করতে নেমে গেলেন।

হিমাদ্রি বারণ করলে কি হবে? বাদলকে খুঁজতে প্রতিমা পরদিনই এল বাদলের বাড়ি। বাড়িতে বলে আসা সম্ভব ছিল না। হিমাদ্রি জানলে নিশ্চয় বাধা দিতো।

কিন্তু না এসেও প্রতিমার উপায় ছিল না। যতবার বাদলের মুখখানা মনে পড়েছে, মনে কষ্ট হয়েছে। মনে হয়েছে, এখন, এই-সময় বাদলের কাছে থাকলে সে হয়তো সান্ত্বনা দিতে পারবে।

আর এতবড় একটা নির্মম কথা, তাই সত্যি হতে পারে? দাদাকে সে অবিশ্বাস করে না। কিন্তু দাদার চেয়েও ত' বড় ডাক্তার আছেন। এ দেশে না হোক, বিদেশে পাঠাবে সে বাদলকে। পাঠাবে মানে, যেতে অনুরোধ করবে।

প্রতিমার কেমন যেন বিশ্বাস, বুঝিয়ে বললে পরে বাদল তার কথা ঠেলতে পারবে না।

কিন্তু কোথায় বাদল? সে শুনলো থিয়েটারের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গাড়ি করে বাদল বেরিয়ে গিয়েছে। ফিরতে ফিরতে রাত বারোটার আগে নয়।

থিয়েটারে যে ছেলেরাও আছে, তাদের কথা মনে পড়লো না প্রতিমার। শীলা আর লীলার কথাই মনে হলো তার। মনে হলো শীলার উগ্র লাল ঠোঁট আর নখগুলোর কথা। মনে হলো লীলার

চোখের কথা। কি রকম একটা শীতল, কঠিন ভাব আছে তার চোখে! কৃত্রিম আঁখিপল্লবের নীচ থেকে চোখ দুটো কিভাবে তাকে দেখছিল পুরীতে, আজও প্রতিমা ভোলেনি।

তাদের সঙ্গে বাদল ঘুরছে? জেনে সে আঘাত পায় না—দুঃখ হয়। বাড়ি ফিরে গালে হাত দিয়ে একলা বসে থাকে। মনে হয়, বাদল নিঃসঙ্গতাকে হয়তো ভয় পাচ্ছে—তাই এমন করে যাকে পাচ্ছে তাকেই সঙ্গে সঙ্গে রাখছে।

বাদল তখন ডান হাতে শীলা আর বাঁ হাতে লীলাকে নিয়ে মার্কেটে ঘুরছে। খুব একটা হালকা ফুর্তির ভাব। ছোকরাদের কাছ থেকে রঙীন বেতের স্প্যানিশ টুপী কিনে মাথায় বাঁকা করে বসিয়েছে তিনজনেই। লীলা শীলার মনে হচ্ছে, এটা একটা জিপ্‌সী ডে। তারা শুধুই ইংরেজী গান করছে, আর বলছে—

'Let us tramp, tramp, tramp,
And be jolly!'

যখন তারা হাসছে না, বা গাইছে না, বাদল একটা লম্বা বেলুন দিয়ে তাদের খোঁচাচ্ছে আর বলছে—Songs, let us have songs!

তাদের হাসি পাচ্ছে হিষ্টিরিয়ার ঝোঁকের মত। মার্কেটশুদ্ধ দোকানদার তাদের দিকে তাকিয়ে ভাবছে, এরা প্রচুর বিয়ার টেনেছে আজ, ভুল নেই তাতে। তারা হাত ঘষছে আর আইয়ে আইয়ে করছে।

গানের কলি যখন থামছে, তখন বাদল কোন একজনকে দেখিয়ে বলছে—ঐ লোকটার নাকটা ভারী মজার। চলো, ওর কাছ থেকে কিছু কিনবে।

কিন্তু বাদল, ও যে বাচ্চাদের খেলনার দোকান।

আমরাও বাচ্চা। আমরা খেলব। চলো বাঁশী কিনি।

মাউথ অর্গ্যান কিনে ঝুড়িতে ফেলে আবার বাদল ঢুকছে দয়ারামের দোকানে। বলছে—এখান থেকে ব্যাগ কেন।

এটা ব্যাগের দোকান নয়, শাড়ির দোকান, বাদল!

তবে শাড়িই কেন।

শাড়ি, ব্যাগ, সুগন্ধি, রুমাল, কাঁচের চুড়ি, মালা, চটি—যা পাচ্ছে কিনছে বাদল! শীলা আর লীলা এতদিনে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছে। বাদলের টাকা, বাড়ি ইত্যাদি তাকে ঘিরে একটা লোভনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিল সত্যিই। কিন্তু মানুষ হিসেবে বাদল ছিল ভীতু, পানসে এবং বোকা।

সেই বাদল এখন যা হয়ে উঠেছে, তাকে এক কথায় এরা বলতে পারে—ইন্টারেষ্টিং!

আর কিছু বলবার নেই। বাদল নাগ বর্তমানে তাদের কাছে অনেকের চেয়ে ইন্টারেষ্টিং।

লীলা আবার 'ট'কে 'ত' বলে। নরম করে উচ্চারণ করে। সে কিছুক্ষণ বাদে বাদেই বলছে—বাদল, তুমি কি ইন্‌তারেস্‌তিং!

বাদল শুনে হাসছে। হাসতে হাসতে মার্কেটের ফুটপাতে পড়ন্ত বিকেলের আলোটার দিকে চেয়ে ভাবছে, এখন সবে বিকেল চারটে। এখন থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত কেমন করে কাটাবে সে? দেখছে স্লেটরঙের রাস্তাটার ওপর পাঁশুটে হলুদ রোদটা কেমন নিস্তেজ হয়ে ঝিমিয়ে আসছে। দেখছে আর ভাবছে, এই সবই থাকবে। এই বিমিশ্র জনতা, এই পথ, এই রোদ, এই লঘুচিত্ত শীলা লীলার মত হাজারটা মেয়ে—শুধু সে-ই থাকবে না। ভাবছে, আর মনে হচ্ছে প্রতিমার কাছে সে কোনদিনও যেতে পারবে না।

শুধু কি শীলা-লীলা? পাঁচটা না বাজতে বাজতে বাদলের বন্ধু-বান্ধবের জনতাকে পাওয়া যায় ধর্মতলায়। তারপর শুরু হয় তাদের বিচিত্র অভিযান। আজ ক্যাপ্রি, কাল প্রিন্সেস, পরশু গঙ্গার ঘাটের ব্যুফে আর নয়তো চাইনিজ কোন বার-এ হানা দেয় তারা। বাদল মদ খেতে এখনো ভয় পায়। সামান্য খেলেই তার মনে হয় প্রচুর নেশা হয়েছে। কোনদিন নাচের মেয়েদের সঙ্গে একপাক নেচে নেয়।

কোনদিন বা গালে হাত দিয়ে বসে থাকে।

এমনি সময় একদিন প্রতিমা তাকে পেয়ে যায় বাড়িতে। পর্দা সরিয়ে প্রতিমা যখন ঢোকে ঘরে, বাদল আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে। বিছানা ছেড়ে উঠতে অবধি পারে না।

প্রতিমার চোখের পাতায় অভিমান কাঁপে। সাধারণ অতি সাধারণ কুশল প্রশ্ন করতে গিয়ে গলাটা গাঢ় হয়ে আসে। সে বলে—কতদিন এসে এসে ফিরে গিয়েছি জানেন? একদিনও পাই না।

তুমি এসেছিলে?

প্রায় রোজই।

ও।

বাদল চেয়ে থাকে। খুব ইচ্ছে হয় বলে—এসো প্রতিমা, আমার পাশে বসো। আমি শুধু তোমার সঙ্গই চাইছি। আমার কপালে হাতটা রাখো। যেমন নিঃসঙ্কোচে এসেছ আগে, বসেছ, কপালে হাত রেখেছ, তেমনি কাছে এসো। আমি একটু স্নেহ চাই, একটু মনের স্পর্শ চাই। তুমি জান না, আমার এখন তোমাকে কি প্রয়োজন।

বলতে চেয়েও বলতে পারে না বাদল। মনে হয় হিমাদ্রির কথা। মনে হয়, প্রতিমার কল্যাণের জন্যই প্রতিমার প্রতি রূঢ় হওয়া উচিত। সে বলে, তুমি যে এসেছ, তা হিমাদ্রি জানে?

না ত!

তাকে না জানিয়ে তুমি এসেছ কেন?

এ কি কথা বলবার ধরন! এ কি গলার স্বর! ব্যথিত হয়ে প্রতিমা চেয়ে থাকে, বলে—আপনার কি হয়েছে? আপনার চেহারা কি হয়ে গিয়েছে? ঐ যে খাবার পড়ে আছে! রাতে খাননি বুঝি? কেন এ রকম করছেন বলুন ত'?

প্রতিমা এমন করে কথা বললে বাদল এখনি উঠে আসতে পারে। প্রতিমার হাত ধরে বলতে পারে, তুমি জান না, আমার জীবন কি

অভিশপ্ত। তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না প্রতিমা। তুমি আমার সঙ্গে থাক।

এত সহজ, তবু এত কঠিন। বাদল বলে, তুমি যাও প্রতিমা। হিমাদ্রি জানলে রাগ করবে।

চলে যাব?

হ্যাঁ প্রতিমা, তুমি যাও।

বাদল উঠে বসে একটু জোরেই বলে। সিঁড়ি দিয়ে কলকণ্ঠে হাসতে হাসতে উঠে আসছিল শীলা-লীলা। দরজার কাছে তারা প্রতিমার মুখোমুখি হয়। প্রতিমা বাদলের দিকে চায়। সে চোখে কোন অভিযোগ দেখে না বাদল। দুঃখ এবং মমতা দুই চোখে ভরে ওঠে প্রতিমার। বাদলের চোখকে ছুঁয়ে সান্ত্বনা জানিয়ে যায় সে নীরবে। মুখে যদি কথা বলতো প্রতিমা, তাহলে বাদলের মনে এমন করে ঘা দিত না।

শীলা চেঁচিয়ে বলে—কই বাদল, আজকে না ষ্টিমার-পার্টি? তুমি এখনো শুয়ে আছ?

বাদল ভাল করে চায়। রঙবেরঙের শাড়ি পেঁচিয়ে পরা, চোখে কালো চশমা, ঠোঁটে রঙ, ভুরু টেনে আঁকা, মনে হয় দুটো পাখী বুঝি আমেরিকান ছবির পোস্টার ছেড়ে নেমে এসে লাফিয়ে লাফিয়ে ঢুকল। পাখীদের কি মস্তিষ্ক আছে? বোধ হয় নেই। তাহলে আর দিনরাত এত কিচিরমিচির করে কি করে? সে উত্তর না দিয়ে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। মনে হয় এই যেন তাদের প্রথম দেখছে।

কিছুক্ষণ বাদে সে বলে, আমি যাব না শীলা, তোমরা যাও।

ঠাট্টা করছো?

বাদলের মনে হলো রেগে গিয়ে চড়া গলায় কিছু একটা বলে। কিন্তু এই সবে প্রতিমা গিয়েছে ঘর থেকে, তার চুলের সুগন্ধির রেশটুকুও বুঝি ঐ দরজার কাছে বাতাসে থমকে আছে। জোরে

কথা বলতেও ইচ্ছে হলো না বাদলের। বললো, ঠাট্টা মনে করলে যদি ভাল লাগে, তাই ভাব। আমি যাব না।

সুপ্রিয় কিন্তু রাগ করবে।

ভাল কথা মনে করেছ, সুপ্রিয়কে বলে দিও, নিচের ঘরটা থেকে ক্লাব তুলে নিতে। গোলমাল আমার আর ভাল লাগছে না।

আজ আর বাদলকে ইন্‌তারেস্‌তিং মনে হলো না লীলার।

সুরেশ্বর সারাজীবন ধরে সঞ্চয় করেছিলেন ছেলের জন্যে। বাদল দেখলো তার সে সঞ্চয়ের কোন প্রয়োজনই হবে না। অনেক দিলেও অনেক থাকবে। আর মাত্র এগারটা মাস যার আয়ু, সে কেন আর এই সব আঁকড়ে বসে থাকবে? আনন্দ করবে? আনন্দ বা আমোদ-প্রমোদের প্রচলিত সংজ্ঞা কি? দেখলো ত' হৈ হৈ করে, পার্টি করে, হুইস্কী খেয়ে। ঝাঁজটা যতক্ষণ রইলো, ততক্ষণই নেশা। নেশা কাটতে একটা বিস্বাদ রিক্ততার অনুভূতি ছাড়া আর কি পেল সে?

এবার খবর গেল হাসপাতাল এবং অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানে। চেক কাটতে লাগল বাদল। যা আছে, তা এমন করে লুটিয়ে দিতে বসলো কেন? বলতে এসে আবার ধমক খেলেন পিসিমা। বাদল বললো, তোমার নামে টাকা লিখে দিচ্ছি, যাও, দেশের বাড়িতে চলে যাও। দেশের বাড়ির আমকাঁঠালের বাগান, ধান জমি, আরো কি সব আছে না? সব নিয়ে থাকগে যাও।

পিসিমা অভিভূত হলেন। সুরেশ্বর জীবিতকালে তাঁর জন্যে ভাত-কাপড় এবং পূজাপার্বণে খরচ করবার কিছু দিয়ে যেতেন মাত্র। এমন করে দিতে জানতেন না।

তবু মনটা টানলো। ভয়ে ভয়ে বললেন, তোকে কে দেখবে?

আমাকে? বাদল হাসতে লাগল। বললো, আমাকে আমিই দেখব। আর আমিও বাড়ি বন্ধ করে দেশ বেড়াতে বেরুব

হয়তো। খালি বাড়ি ধরে বসে থেকে তুমি কি করবে পিসিমা? তুমি যাও।

বাদল হঠাৎ দানধ্যানে মেতে উঠেছে শুনে তার বাবার গুরুদেবের চিঠি নিয়ে আশ্রমের লোক এল। সেখানেও কিছু দিল বাদল।

এ্যাটর্নী পিতৃবন্ধু। ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন। বললেন, কি করছ বাদল? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

পাগলামির কি দেখলেন?

হাসপাতালে, মিশনে, অনাথ আশ্রমে এমন করে টাকাগুলো দিয়ে দিচ্ছ? পাগলামির আর বাকি রইল কি?

চেয়ার টেনে বসে তর্ক শুরু করলো বাদল। বললো, দানধ্যান তাহলে খারাপ কাজ?

দানধ্যান খারাপ কেন হবে? তবে তোমার ত' আর সে বয়স হয়নি।

ভাল কাজ করতে হলে বুড়ো হতে হয়, আর মন্দ কাজ করতে হলে অল্পবয়স ভাল, এটা কোন বিচার হল?

তুমি যে শুধু তর্ক করছো। তর্কের কথা ত' নয়। ভেবে দেখতে হবে ত'! তোমার বাবা এত কষ্ট করে টাকাপয়সা জমালেন। তুমি যদি সেগুলো এমনি করে উড়িয়ে দাও, ভাবো ত' তিনি থাকলে আজ কত কষ্ট পেতেন?

তিনিই ত' পাগলামি করে গিয়েছেন। বাদল প্রায় চেঁচাতে থাকে—পাঁচশো টাকা খরচ করে আমার কুষ্ঠি করিয়েছেন, আমার মঙ্গলের জন্যে পঞ্চাশটি জ্যোতিষী, সন্ন্যাসী, যত সব জালজোচ্চর সকলকে টাকা দিয়েছেন। এই মরবার ছমাস আগেও কে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে এনে আমার হাত দেখিয়ে টাকা ঢেলেছেন কতকগুলো। সেগুলো পাগলামি নয়?

আর কথা বাড়ান না রমেনবাবু। ব্যানার্জি এণ্ড ব্যানার্জি ফার্মের অন্যতম অংশীদার রমেন ব্যানার্জি। বলেন—তোমাকে দেখে বাপু

মনে হচ্ছে, সুরেশ্বরও পাগল ছিল। এত ক্ষ্যাপামি কি একপুরুষে বর্তায়? কি সর্বনেশে কথা।

পাগল আর পাগলামি, এই সব কথা শুনে বাদলের শেষ অবধি মনে হয় যে, হ্যাঁ, পাগলদের জন্যেও কিছু খরচ করা উচিত। সে ভেবে দেখে, সে শুধু রাঁচির কথা জানে। তার সাহায্য ব্যতিরেকেও হয়তো রাঁচির হাসপাতাল চলবে। কিন্তু আরো কত যে ছোট-বড় প্রতিষ্ঠান আছে! 'টাকা দিতে চাহি। সত্বর যোগাযোগ করুন'— এই মর্মে সকল উন্মাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতি আবেদন জানিয়ে সে বিজ্ঞাপন দিয়ে বসে।

প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা ত' আর উন্মাদ নন। তবে তাঁদের মধ্যেও শঙ্করের মতো যুক্তিবাদীর অভাব নেই। কেউ বলে বসেন— এসব যে আপনি করছেন, আপনি কি ভোটে দাঁড়াতে চান? পপুলার হচ্ছেন?

না।

তবে কি আরো কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে? আপনি কি আমাদের ফাঁসাতে চান?

না।

ভদ্রলোক মুচকি হেসে বলেন, আপনার তাহলে আমাদের ওখানে সম্মানিত অতিথি হবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। রইলো আপনার চেক। এ রকম কারবার শুনিনি, দেখিনিও। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে টাকা লুটিয়ে দিচ্ছেন? এ চেক নির্ঘাৎ ফিরিয়ে দেবে ব্যাঙ্ক। আপনি এ রোগ পেলেন কোথা থেকে? মাতুল বংশ থেকে? না সাক্ষাৎ পিতৃপুরুষের মধ্যেই ছিল?

তার চেক সম্পর্কে সংশয়? বাদল লাল চোখ করে তাকিয়ে থাকে? তারপর চেকশুদ্ধ ভদ্রলোককে টেনে নিয়ে গাড়িতে তোলে। নিজেই চালায়। ভদ্রলোকের আর বুঝতে বাকি থাকে না, তিনি এতদিনে সবচেয়ে মারাত্মক একটি টাইপের কবলিত

হয়েছেন। তিনি প্রথমে সজোরে এবং পরে সানুনয়ে তাঁকে নামিয়ে দেবার প্রার্থনা জানান। গাড়ির ষ্টিয়ারিং-এ বাদলের হাত দেখে তাঁর প্রতিমুহূর্তে মনে হয়, এই বুঝি ঘটলো একটা দুর্ঘটনা।

বাদল তাঁকে নিয়ে ব্যাঙ্কে মুকাবিলা করিয়ে দেয়। ভদ্রলোক যখন দেখেন যে, না, চেকও ঠিক ঠিক আছে, এবং বাদলের নাম-ধাম সবই ঠিক আছে, তখন—পাগল নয়, মৎলব নেই—তবে কি?

এই প্রশ্ন করে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়তে চান। কিন্তু এমনই মানুষের মন যে, মূর্ছিত হতে হতেও চেকটি ছাড়েন না হাত থেকে। বাদল ব্যাঙ্কের মধ্যেই তাঁকে ঝাঁকাতে থাকে এবং চেঁচিয়ে বলে, তবে দয়া। দয়া, দাক্ষিণ্য, এসব কথাগুলো শোনেননি? মিছিমিছিই আশ্রম খুলে বসেছেন?

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মানুষগুলি অনেক বিচক্ষণ। তাঁরা নিমীলিত চোখে মৃদু হাস্য করেন এবং যা পান, দ্রুত সুরক্ষিত করে, গুরুদেবের ছবি এবং গীতার ভাষ্য, New Sun in the horizon of spiritual world প্রমুখ অমূল্য সাহিত্যগুলি রাখেন বাদলের সামনে। বাদল তাতেও খুশি হয় না। তাঁদের সঙ্গে তর্ক করে বলে—দিচ্ছি, আর অমনি নিচ্ছেন? কেন দিচ্ছি, কেন নিচ্ছেন, সে বিষয়ে আপনাদের মনে কোন সংশয় বা প্রশ্ন নেই?

আপনি দিচ্ছেন, আর আমরা প্রশ্ন করব? আপনি এ রূঢ়তা আমাদের কাছে আশা করলেন কি করে?

ধৈর্য সহকারে বৃদ্ধ স্বামীজি বোঝান—এই যে দেবার বাসনা হয়েছে আপনার, এ একটি মহৎ চিত্তবৃত্তি। এই বৃত্তি আপনার মধ্যে সুপ্ত ছিল, এখন যে জাগল, সে জানবেন তাঁর অসীম কৃপাতেই সম্ভব হলো। এখন এই যে জাগ্রত শুভ বুদ্ধি, এ ত' বিশ্বাস দ্বারাই সম্ভব হলো।

কে বললো? আপনি কি মনে করেন, আপনার ঐ গুরুদেব আমার মধ্যে বিশ্বাস জাগ্রত করেছেন? আমি ঘোর অবিশ্বাসী, জানেন?

আহা, এই যে, অস্বীকার করবার চেষ্টা, এর ভেতর দিয়েই যে বিশ্বাস প্রতীয়মান হচ্ছে।

বলছি যে বিশ্বাস-বিশ্বাস করবেন না?

বিশ্বাসের ফলেই এই দয়ার সঞ্চার। আর সেখানে আমরা যুক্তি-তর্ক তুলে কি সিদ্ধিকে আরো পেছিয়ে দেব?

বটে? সিদ্ধি লাভও এগিয়ে আনতে চান? সর্বনেশে লোক ত' মশাই আপনারা! যতই চেষ্টা করুন, জানবেন, ও সিদ্ধিলাভ বা মোক্ষলাভ এগারো মাসের আগে হচ্ছে না। জানলেন?

স্বামীজিরা উঠে পড়েন। তবু বৃদ্ধটি অসীম ক্ষমার হাসি হাসতে থাকেন।

বলতে বলতে যান—বাইরে অভিনয়, বাইরে ঔদ্ধত্য, এ যে অন্তরে প্রবলা ভক্তির লক্ষণ। দেখে দেখে আমার শ্রীমহাপ্রভুর কথাই মনে হলো। বিবেকানন্দ কি? মহাপ্রভু, বিবেকানন্দ, এঁরা ত' আগে যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন! তার পরে না ভক্তি এবং বুদ্ধি—দুই পথ দিয়ে জাগ্রত হলো ভগবৎ চেতনা?

বাদলকে দেখতে এবার তার বন্ধুবান্ধব আসে। একদিনের সম্পর্ক ত' নয়। বহুদিন বহু বছর ধরে তারা একসঙ্গে মিশেছে। মোটা সুপ্রিয়র মনটা ভাল। সে বলে, কি হয়েছে বলবে ত'? হঠাৎ কি হলো?

বাদল বলে—কিছু না।

শঙ্কর বলে—এর পেছনে নিশ্চয় কোন কার্য-কারণ আছে। বাদল, তুমি কি জন্যে এ রকম করছ, তা আমিই বলে দিতে পারি। কিন্তু তুমিও সাহায্য কর। বল, হঠাৎ কি আঘাত পেয়েছ? মনে লেগেছে কোন্ কারণে?

বাদল বলে—শঙ্কর, তুমি রীতাকে বিয়ে করছ না কেন?

শঙ্কর বোকা হয়ে যায়। বলে—তাইত! এ প্রশ্ন কেন বাদল?

যে বাদলকে চিরদিন তারা কথা বলেছে, উপদেশ দিয়েছে, যে বাদল শুধু চুপ করে শুনেছে আর ঘাড় নেড়ে গিয়েছে—সেই বাদল

আজ শঙ্করকে বলে, শোন শঙ্কর, তোমাকে আমি দু'বছর ধরে দেখলাম। ভালবাসছ, তার মধ্যেও হাজারটা যুক্তি, তর্ক, বিশ্লেষণ আর মার্কসীয় ব্যাখ্যা। জীবনটা কিন্তু ও রকম বিচার করে করে বাঁচা যায় না। তুমি কাজ পেয়েছ। রীতা ত' অনেকদিনই চাকরী করে স্কুলে। আমি বলি, তুমি বিয়েটা করে ফেল। বিয়ে করে ফেল, যে কয়দিন পার জীবনটা ভোগ করে নাও। তুমি রীতার কাছ থেকেও ঐরকম একটা যুক্তিবাদী মনই আশা কর। দেখ, মানুষ বেশি চায় না। ও রীতাই বল, আর যেই বল, ভালবাসা আর আশ্রয় পেলে সব মেয়েই খুশি হয়। সেই কবে থেকে দেখছ ত'! রীতা বারবার আসে। প্রত্যাশা নিয়ে আসে। আর তুমি ইডিয়ট, মুর্খ, ডায়ালেক্‌টিকের অক্ষম বাহন একটা, তুমি শুধু তাকে চীনের সমাজ বিবর্তন বোঝাচ্ছ!

বাদল!

কোন কথা শুনতে চাই না। আমি দেখতে চাই, কালই তোমরা রেজিষ্ট্রারকে নোটিশ দিচ্ছ এবং সাতদিনের মাথায় বিয়ে করছো। হ্যাঁ, ঠিক সাতদিনের মাথায়। আমার এই বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে। সুপ্রিয়, তুমি ঐ সৃষ্টিছাড়া, না-মেয়ে না-পুরুষ, ঐসব শীলা লীলার পেছনে না ঘুরে পার ত' এই বিষয়ে সাহায্য কর। কি কি লাগে বিয়েতে? না কি শঙ্কর? তোমারও কি শেষ অবধি টোপর পরবার বাসনা আছে?

বাদলের কথায়-বার্তায় এমন একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে যে শঙ্কর শেষ পর্যন্ত ঘাড় নেড়ে রাজী হয়ে তবে ছুটি পায়।

বাদল কোন কাজই অসমাপ্ত রাখে না, নোটিশ দেবার ব্যবস্থা অবধি পাকা করে ফেলে।

সুপ্রিয় বলে, দেখে শুনে আমারও বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে বাদল।

ঐ ছুটোর একটাকে?

না, না—এই ধরো প্রতিমার মতো মেয়ে···

কি ? প্রতিমাকে বিয়ে করবে তুমি ?

বাদল ক্ষেপে ওঠে। সে সুপ্রিয়র কলার ধরে ঝাঁকায়। বলে, তোমার মতো অপদার্থ একটা ছেলে, তুমি যদি প্রতিমার কথা ভেবেছ তো মজা দেখবে। খবরদার !

সুপ্রিয়—এই ধরনের প্রত্যাশা যে কখনো মনেও আনবে না—সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে কলার ছাড়াতে পারে। হাঁপিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে চৌকিতে শুয়ে পড়ে। বলে—বাদল, তুমি এত তাড়াতাড়ি বদলাচ্ছ যে, তোমার সঙ্গে তাল রাখতে পারছি না আমি। এমন ভয় ধরিয়ে দিলে, প্রতিমা কেন, প্রতিমা নামের কোন মেয়েকে দেখলেই আমার ভয় করবে। আর চিরকালের রোগা পটকা, তোমার কব্জিতেই বা এত জোর এল কোথা থেকে ? বল।

জোর তোমার একচেটিয়া ? বাদল আবার ধমকে ওঠে।

শেষ অবধি বাদলের বাড়িতেই বিয়ে হয়। প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শঙ্কর, অত্যন্ত বাধ্য এবং সুবোধ ছেলের মতো ধুতি পাঞ্জাবী আর ফুলের মালা পরে বিয়ে করতে বসে। হলোই বা রেজিষ্ট্রেশানের বিয়ে। তারপরে রীতাকে সিঁদুর পরাতে গিয়ে যে কোন নূতন বরের মতোই তার হাত কেঁপে যায় এবং সে-ও লজ্জা পায়। দেখে শুনে হতাশ হয়ে সুপ্রিয় মাথা নাড়ে। বলে—মর‍্যাল কারেজ নেই ? চুরি ত' করছিস না ! হাত কাঁপছে কেন ? মিছেই এতদিন ধরে বড় বড় গালভরা কথা কপচালি, আর ঝাণ্ডা তুলে এ-চাই, ও-চাই চেঁচিয়ে জেল খেটে এলি। আসলে তুই কিচ্ছু না।

বন্ধুরা নিজেরাই নিজেদের চা খাবার পরিবেষণ করে। এ পরিবেশে হিমাদ্রি ও প্রতিমাকে ডাকবার ইচ্ছে ছিল শঙ্করের। কিন্তু বাদলের প্রবল চোখ রাঙানীতে সে সাহস পায় না।

বিয়ের পর বাদলের বাড়িতে তিনদিন ধরে মধুচন্দ্রিমা যাপন করে শঙ্কর আর রীতা, আর শানাই শুনে মন খারাপ হয়ে যায় বাদলের।

হলোই বা রেকর্ডের বাজনা—তবু শানাই ত'। মনটা তার ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে যায় প্রতিমার জন্যে।

প্রতিমা বোধ হয় অন্তর্যামী। একদিন বাদল তাকে তাড়িয়েই দিয়েছে, তবু সে সব কথা সে মনে রাখে না। এসে উপস্থিত হয়। ভীরু এবং কুণ্ঠিত মিনতিতে চেয়ে থাকে। চোখের ভাষায় আশ্বাস চায়। আজও কি বাদল তাকে তাড়িয়ে দেবে?

কেমন করে বাদল তাকে প্রত্যাখান করে? বাদল আজ সাদরে সঙ্কোচের সঙ্গে তাকে ডেকে আনে ঘরে। বলে, বসো প্রতিমা। সেদিন বড় রূঢ় ব্যবহার করেছি। মনে রাখনি ত'?

প্রতিমা বলে, মনে রাখলে কি আজ আসতাম আবার?

তা জানি প্রতিমা। কি জান, আমি ঠিক জানতাম তুমি আসবে।

কি ক'রে? প্রতিমার গলা প্রায় শোনা যায় না।

বাদল বলে, বাঃ, মনে মনে তোমাকে কি রকম ডাকছিলাম। মনে হচ্ছিল, যে কোনদিন, যে কোন সময়ে তুমি এসে পড়তে পার। শঙ্করদের বিয়ের পর থেকে আর বেরোইনি বাড়ি থেকে। মনে হয়েছে, যদি তুমি এসে ফিরে যাও?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে দুজনেই। তারপর প্রতিমা বলে—দাদার কাছে আমি সব শুনেছি। সেইজন্যেই কি আপনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন অমনি করে? কেন? আমি সেই কথাই জানতে এসেছি আজ। আপনি কি মনে করেন,—কথাটা আর যেন শেষ করতে পারে না প্রতিমা।

বাদল বলে—কি মনে করি প্রতিমা?

—আপনি কি মনে করেন, দাদা যা বলেছে তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে আমাকে এমনি করে দূরে সরিয়ে দিলেই আমার ভালো লাগবে?

—প্রতিমা!

—আপনি জানেন, সেদিন থেকে আমি কত কষ্ট পেয়েছি?

বাদল এখন তার নিরুপায় অবস্থা যেমন করে বোঝে, এমনটি আর কখনো বোঝেনি। সে বলে—সবই ত' জান প্রতিমা। হিমাদ্রি ত' বলেছে তোমাকে! বল, কেমন করে আমি দেখা করতাম তোমার সঙ্গে? কি বলতাম? সত্যিই, আমার কি তোমার সঙ্গে দেখা করা উচিত? নিজেকে এমন প্রশ্রয় দেওয়া উচিত? কি লাভ তাতে, বল?

প্রতিমা ঝরঝর করে কাঁদে। বলে—এ কখনোই শেষ কথা হতে পারে না। নিশ্চয় আরো ডাক্তার আছেন, তাঁরা আরো জানেন—

—না প্রতিমা, বাদল বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়ে। বলে—সত্যিই এর কোন চিকিৎসা নেই। মৃত্যু অতি সুনিশ্চিতভাবে অবধারিত। আর, হিমাদ্রি ত' আর নিজের জ্ঞানবুদ্ধিতে এ কথা বলেনি। সে ত' অন্য ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু তুমি কেঁদ না প্রতিমা। তোমার চোখের জল আমার ভাল লাগে না। আর তুমিও যদি কাঁদ, কার সঙ্গে আমি কথা বলব বল?

প্রতিমা বাধ্য মেয়ের মতো চোখ মোছে। বলে—এখন কি হবে?

বাদল বলে—কি আর হবে! আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

মনের অস্থিরতা ঢাকতে বাদল পায়চারী করে ঘরে। তারপর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে—ভাবতে পার প্রতিমা? এতদিন ধরে অপেক্ষা করব আমি? অপেক্ষা করা চলে, যদি তার পেছনে কোন প্রত্যাশা থাকে। কিন্তু এ কি দুঃস্বপ্ন বল ত'? এখন ভাবলে নিজের ওপর আমার ঘেন্না হয়। ঘেন্না হয় এই ভেবে যে, চিরদিন শরীর শরীর করে কি করেছি! জীবনটা উপভোগ করলাম না, মানুষের মতো বাঁচলাম না—অথচ আজ মনে হয়, সবগুলো বছর, সবগুলো দিন নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

গভীর সমবেদনায় প্রতিমা বাদলের হাতখানা ধরে চুপ করে বসে থাকে। বলে—এখন কি করবেন?

বাদল বলে—তোমাকে একটা অনুরোধ করব। তোমাকে শুনতে হবে প্রতিমা। শোন, আমি খুব ভেবে বলছি—এখন আর সত্যিই আমার কথা ভাবা উচিত নয় তোমার। তুমি আমাকে ভুলে যাও।

প্রতিমা আবার কাঁদতে শুরু করে। ভুলে যাও বললেই কি সে ভুলতে পারে? এক একজন মেয়ে এক এক ধরনের। প্রতিমার মনে স্নেহ আর মমতাটা সহজে আসে। বাদল যতই তাকে বোঝায়, যতই বলে যে, এখন আর বাদলের কথা ভেবে সে কিছু করতে পারবে না—অভিশপ্ত একটা মানুষের কথা ভাববার কোন মানেই হয় না তার, ততই প্রতিমা মাথা নাড়ে। না, সে ভুলতে পারবে না। কেমন করে ভুলবে?

কথাগুলি থামিয়ে বাদল এবার আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকে। একটা নতুন কথা মনে হচ্ছে তার! প্রতিমাকে সে যেন বুঝতে পারছে। বলে—ভোলা যায় না, তাই না প্রতিমা?

এবার প্রতিমা সম্মতি জানায়। হ্যাঁ, এই তার মনের কথা। ভোলা যায় না। বিস্মরণ কি অতই সহজ?

বাদল এবার হতাশ হয়ে বসে পড়ে। ভাবতে চেষ্টা করে—যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে। কেমন যেন মনে হয়, কোন কথা না বলে, শুধু চোখের জল ফেলে, আর তাকে যে ভুলতে পারবে না প্রতিমা, সেই কথাটা মাথা নেড়ে জানিয়ে, প্রতিমা তাকে বেঁধে ফেলছে। অসহায় করে ফেলছে। মনে হয়, এখন যদি এইখানে বসে থাকে তারা দুজন, আর প্রতিমার এই স্বল্প দুটো-একটা কথায়, জলভরা চোখের চাহনিতে যে সান্ত্বনা আছে, শান্তি আছে, তা যদি তাকে এমনি করে ঘিরে ধরতে থাকে, তাহলে বাদল কোনদিনও প্রতিমার কাছ থেকে সরতে পারবে না। এমন কি, প্রতিমার দিকে চেয়ে, প্রতিমার কোলে মাথা রেখে—শেষ নিশ্বাস ফেলবার একটা ইচ্ছেও তার হতে পারে। কি হয়, যদি প্রতিমাকে সে বিয়ে করে ফেলে? সামান্য কয়টা দিন

না হয় একসঙ্গে আনন্দ করে পরিপূর্ণভাবে বাঁচা গেল। তারপরে না হয় যা আছে সব প্রতিমাকে দিয়ে সে মরে যাবে। গানে ও কাহিনীতে যেমন শোনা যায়, পড়া যায়, তেমনি বাদলের স্মৃতিটুকু নিয়ে প্রতিমা বেঁচে থাকবে। এমন কি আর হয় না? জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে তাই কি মানুষ গানে আর কবিতায় লিখবে চিরদিন? জীবনটা কি মানুষের সব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চিরকালের জন্যে ডানা কেটে, শিকল বেঁধে বিধিনিষেধের পিঞ্জরে রেখে দেবে? সেইজন্যেই কি মানুষ মুক্তি চাইবে, সকল অন্তরের ইচ্ছাকে লিখে রেখে যাবে কবিতার অক্ষরে—সুর দিয়ে যাবে গানের সুরে?

এইরকম রোমান্টিক-ভাবে সে ভাবছে দেখে বাদল ভয় পেয়ে যায়। ছিঃ, এমন স্বার্থপর হয়ে গিয়েছে সে! কেন সে নিজের কথাই ভাবছে? এমন স্বার্থ চিনে চিনে বেঁচেছে চিরদিন যে, এখন মৃত্যু আসন্ন জেনেও সে নিজেকে ছাড়িয়ে, নিজের চিন্তা অতিক্রম করে এতটুকু উদার হতে পারছে না! এই কি মানুষের মতো কাজ?

প্রতিমা যে তাকে ভালবাসে, সে কথাই বা সে স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নিচ্ছে কেন? এমনও ত' হতে পারে যে, প্রতিমা স্বভাবে স্নেহময়ী। তাকে সে স্নেহের চোখে, মমতার চোখেই দেখেছে।

এই যে এখন বসে আছে, সুকুমার, শান্ত, নম্র, উনিশ-কুড়ি বছরের একটি ভালো মেয়ে—তাকে দেখে বাদলেরই মমতা হচ্ছে। মনে হচ্ছে, একে মিছিমিছি সে নিজের কথা, নিজের দুঃখ জানিয়ে দুঃখ দিচ্ছে, ভারাক্রান্ত করছে।

তার সে আবেদনে প্রতিমা যে সাড়া দিচ্ছে, সে তার স্বভাবের মাধুর্য এবং করুণার জন্য। সে সুযোগ কি বাদলের এমন স্বার্থপরের মতো নেওয়া উচিত?

সে প্রতিমাকে বলে—চল প্রতিমা, ওঠ তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। রাত হয়ে গেল যে! হিমাদ্রি চিন্তা করবে, তোমাকে খুঁজবে। তুমি ত' এমন করে বেরোও না কোনদিন।

—কিন্তু কি করবেন, বললেন না ত'?

বাদল হাসে। একথা বলে না, যে সঙ্কল্প সে নিয়েও নিতে পারছিল না, মনটা স্থির করেও আবার ভেঙে যাচ্ছিল যে স্থৈর্য—প্রতিমার কারণে, তার শুভ কামনায়—বাদল তাই-ই করবে। চলে যাবে বাড়ি ছেড়ে। কাঁচের দরজা বন্ধ করে, দোতলায় বসে, না চাইতে সব কিছু হাতের মুঠোয় পেয়ে—অনেকদিন সে বিশেষ হয়ে, বিশিষ্ট হয়ে বেঁচেছে। সে যতদিন জীবনকে পরিহার করে নিজের একটা রঙীন কাঁচে ঢাকা জগৎ তৈরী করে বসে ছিল (একেই বোধহয় গজদন্ত মিনারে বাস করা বলে)—ততদিন তার আশপাশ দিয়ে জীবনের কত রঙ, কত রূপ, কত জীবন্ত প্রাণপ্রবাহ কলোচ্ছ্বাসে বয়ে গিয়েছে, আজও যাচ্ছে। সে কলোচ্ছ্বাসে, সে উর্মিতরঙ্গে কত সুরই না বেজেছে। পুরীর সমুদ্রের সে ঢেউগুলির মতো তার মধ্যেও কত রকম আহ্বান। কখনো উত্তাল—কল্লোলের সুর, কখনো শান্ত—স্নিগ্ধ সান্ত্বনার সুর। আজ বাদল তার মধ্যে মিশতে চায়, দশজনের একজন হতে চায়। যে কয়দিন আছে, সে কয়দিন সে নিজেকে ভুলে তার মধ্যে সাধারণ হয়ে বাঁচতে চায়।

একথা সে প্রতিমাকে বলে না। হয়তো প্রতিমার আঘাত লাগবে। সে আঘাত দুদিনেই প্রতিমা ভুলে যাবে। কোনদিন হয়তো প্রতিমা আর কারুকে নিয়ে সুখী হবে। সুখ ও শান্তির সেই সব পূর্ণ মুহূর্তে, বাদলের কথা তার মনে একটা বেদনার স্মৃতি হয়ে জেগে থাকবে মাত্র। সে বেদনায় কাঁটা থাকবে না। থাকবে একটা করুণ মেদুরতা, সুরের অবশেষের মতো।

সে বলে—কি আবার করবো? যেমন আছি তেমনই থাকব।

আমাদের বাড়িতে যাবেন না?

রোজ কি আর যেতে পারব?

আমি না হয় আসব।

বেশ ত', যখন ইচ্ছা তোমার। এ কথায় বলবার কি আছে

প্রতিমা ? যখন তোমার ইচ্ছা হবে, তখনই এসো। চলো।

গাড়িটা প্রতিমার বাড়ির কাছে পৌঁছতে বাদল বলে—আজকে আর যাব না প্রতিমা, জানলে ? একটু রাত হয়ে গিয়েছে। তুমি যেতে পারবে ত' ?

প্রতিমা নামবার আগে চেয়ে থাকে বাদলের দিকে। বাদলের মনে হয় এখনকার এই মুহূর্তটাকে সে ধরে রাখে। ইচ্ছা করে প্রতিমাকে বলে—প্রতিমা, তোমাকে যা বলেছি সব মিথ্যা কথা। আমার সঙ্গে তোমার আর দেখা হবে না। এই শেষ। এই যে তুমি চলে যাবে—দরজাটা বন্ধ করে দেবে সিঁড়ি দিয়ে উঠে—তখন তোমাকে ঐ দরজার পেছনে হারিয়ে যেতে দেখব—সেই শেষ। তারপরে তোমাকে আমি আর দেখব না। তবে তোমাকে ভুলব না। তোমাকে আজ আমি হারিয়ে ফেলছি ঠিকই, আবার তোমাকে যেন নিয়েও যাচ্ছি সাথে সাথে—এ কথা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না, বলতে পারব না।

বাদল আবার হাসে। খুব মনখোলা, মিষ্টি সস্নেহ হাসি। বলে—কি হলো ? রাত যে ন'টা বাজে ! এখন যদি তুমি চটপট নেমে পড়, তাহলে হয়তো আমি একটা সিনেমাও দেখতে পারি।

—একলা ?

—না। একলা কেন ? বন্ধুরা সবাই রয়েছে যে ! ওরা অপেক্ষা করবে চৌরঙ্গীতে।

—ও !

বিব্রত হয়েই নেমে পড়ে প্রতিমা। নেমে দাঁড়িয়ে বলে—দাদাও বলছিল, আপনার কাছে যাবে, আপনার সঙ্গে মেলামেশা করা দরকার। একলা একলা থাকবার কোন মানে হয় না।

—হিমাদ্রি ? হিমাদ্রি ত' যখন খুশি আসতে পারে। এলেই পারে। আমি ওকে বিব্রত করি না, জানি ডাক্তার মানুষ। সময় ওর কম।

এবার চলে যায় প্রতিমা। বাদল দেখে রাস্তাটা পেরিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠলো, দরজাটা ঠেললো—ঘরে ঢুকে দরজার মুখে দাঁড়ালো। ঘরের আলো পিছনে আর রাস্তার আলো মুখে পড়ে অনেকটা যেন ছবির মত দেখতে হলো। যেন ফ্রেমে আঁটা একখানা ছবি। বাদলের দিকে তাকাল প্রতিমা, একটু হাসল বুঝি। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিল।

এখন বাদল চলে যেতে পারে। তবু বাদল চেয়ে রইলো। ওপরের ঘরে এবার বাতি জ্বলল। কিন্তু পর্দা নড়ল না জানলা থেকে, এল না প্রতিমা। শুধু ঐ বাতিটা দেখে জানা গেল, এখন ঐ ঘরে প্রতিমা আছে।

আর দাঁড়িয়ে থাকবার কোন মানেই হয় না। চলে এল বাদল।

চলে যাব মনে করলেই চলে যাওয়া যায় না। একবার বাদল ভাবল, সব বিলি-ব্যবস্থা করে রেখে যাব। আবার ভাবল, আমিই যখন থাকব না, তখন আর বাড়ি এবং অন্য সব কিছুর কি হবে না হবে ভেবে কি হবে।

রমেনবাবুকে একটা রেজেস্ট্রি চিঠি লিখল। সে কিছুদিনের জন্য বাইরে চললো। মানুষের জীবনের কথা বলা যায় না। তার সব কিছুর ভার সে রমেনবাবুকে দিয়ে যাচ্ছে। যদি এবং যখন তার মৃত্যু সংবাদ পাবেন রমেনবাবু—তখন যেন তার যা কিছু আছে, সবই চ্যারিটিতে দিয়ে দেন। তবে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নয়। রমেনবাবুর বিচার-বুদ্ধির ওপর তার আস্থা আছে। তিনি যা ভাল বুঝবেন, তাই যেন করেন। নগদ টাকা আর বিশেষ নেই। যা আছে, টাকার সে অঙ্কটা সে জানাচ্ছে, এটা প্রতিমার নামে, তার উপহার হিসাবে দিলে সে খুশী হবে। এটা তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা।

বাড়ির ঘরে ঘরে তালা পড়লো। বাদল বাইরে যাচ্ছে, এইটুকুই জানলো সবাই। কোথায় যাচ্ছে এবং কতদিনের জন্য যাচ্ছে, এ প্রশ্নের কোন জবাব মিলল না।

পকেটে কিছু টাকা ছিলো। আর মদ খেলে, অন্ততঃ অপরিমিত পরিমাণে খেলে, লিভার পচে যে মৃত্যু এগিয়ে আসে পচা লিভার আর নিস্তেজ পাকস্থলী ধরে—সে কথা হিমাদ্রির কাছে বাদল অনেকবার শুনেছে। মাঝে একবার পোস্টগ্র্যাজুয়েটের সময়ে সুপ্রিয় হুজুগ তুলেছিল, মদ খেতে হবে। বাদল টিফিনের সময়ে ডাব খেত। তাই দেখতে দেখতে একদিন সুপ্রিয় চেঁচিয়ে উঠলো—বাংলাদেশে শান্তি চাই না। এই 'শান্তি চাই, শান্তি চাই' বলে শঙ্কর যদি ফের চ্যাঁচাবে ত' দেখবে মজা!

সে যে বাংলাদেশের জন্য শান্তি চাইছে না, সে যে গোটা পৃথিবীর জন্যেই শান্তি চাইছে, সে কথা শঙ্কর বলতে চাইলেও সুপ্রিয় বলতে দেয়নি। টেবিলে ঘুসি মেরে বলেছিল—ডাবের জল, ঘোলের সরবৎ আর মাথায় তেল মেখে মেখে বাংলাদেশের ছেলেগুলো গোল্লায় গেল। তাদের রুক্ষ মাথায় বৈশাখের রোদে পিচের রাস্তায় ছুট করানো দরকার। আর তা যদি না পার তো মদ খাও। মদ খেয়ে জ্বলে যাও।

তখন ক'দিন বাদলের পয়সাতেই হুইস্কী খেয়েছিল তারা। হিমাদ্রি খেত এবং উপদেশ দিত। একদিন কাঁচা মাংসের টুকরো এনে হুইস্কীতে ডুবিয়ে রেখে, আধঘণ্টা বাদে তুলে ধরে বলেছিল—তোমাদের পাকস্থলীরও এই দশা হবে, বুঝলে সুপ্রিয়? মেডিক্যাল কলেজে আমরা নিত্যি এই সব রুগী দেখছি। প্রথমে লিভার পচবে, তারপর মরবে!

—তুমিও ত' খাচ্ছ। বাদল বলেছিল।

হিমাদ্রি বলেছিল—আমি রোজ কতটা মাখন খেয়ে আসি জান? মাখন খেলে আর কোন ক্ষতি হয় না।

সুপ্রিয় হিমাদ্রিকে মৎলববাজ শয়তান বলে গালাগালি দিয়েছিল। বলেছিল—নিজেকে ত' বেশ বাঁচিয়ে চলছো। আমাদের সে কথাটা জানালে কি ক্ষতিটা হতো ?

এখন বাদলের সেই কথা মনে পড়লো। সেই ধারণা থেকেই সে চীনেপাড়ায় এই চীনে বার-এ ঢুকলো।

পকেটে যখন কিছু টাকা আছে, তখন বাদল আর ভাবল না। একটু নেশা হতেই তার মনে হলো তার ক্ষিদে পাচ্ছে। ক্ষিদে পেলে যে খেতে ভালো লাগে, সে কথাও সে এতদিন জানেনি। সে খেতে না চাইতে এতরকম খাবার তার নেকনজরের অপেক্ষা করেছে যে, ক্ষিধে পেলে খেতে কেমন লাগে, তাই সে জানে না !

অনেক খাবার পর, যখন নেশাটা বেশ গাঢ় হয়েছে—তখন বাদলের খেয়াল হলো পকেটে অত টাকা নেই। ওয়েটার ভাবলো বাদল ঠাট্টা করছে। এই ক'দিন আগেই ত' সে এসে কয়েকশো টাকা খরচ করে বন্ধুবান্ধবদের খাইয়ে গিয়েছে। সে হাতে হাত ঘসে হাসতে লাগল।

বাদল তাকে বিশ্বাস করাতে না পেরে ম্যানেজারের সামনে দুই পকেট উলটে ফেলে যা টাকা ছিলো ছড়িয়ে দিয়ে টেবিলের ওপর দুই হাত ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো।

ম্যানেজারের রসিকতার বোধ আছে। তিনি ভেবে দেখলেন, যে খদ্দের এতদিনে এত টাকা দিয়েছে বারকে—আজ যদি সে কোন খামখেয়ালী বশতঃ টাকা না দেয়—তবে এটাকে হেসে খেলেই নেওয়া উচিত।

মাঝরাতে বাদলকে ঠেলে তুলে দিল তারা। বললো—বাড়ি যাও।

—নো হোম। বলে বাদল আবার ঘুমোবার চেষ্টা করছিল।

ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করল—গাড়ি কোথায় ?

—নো কার। বলে বাদল দাঁড়িয়ে আত্মকরুণায় চোখের জল ফেলে ম্যানেজারকে জড়িয়ে ধরে বললো—না হোম, নো কার, নো মানি।

তারপর ম্যানেজারের গালে একটা চুমো খেয়ে সে কাঁচের দরজা ঠেলে বেরুলো। কথা কইতে গিয়ে মনে হলো কথাটায় একটা সুর আছে। সেটা গান করে বলতে চেষ্টা করলো—নো হোম—নো কার—নো মানি!

তারপর পথের ধারে দেখলো ঘোড়ার জলখাবার চৌবাচ্চা একটা। সেটা শুকনো। মনে হলো, রাত কাটাবার পক্ষে একটা প্রকৃষ্ট জায়গা। সেখানেই শুয়ে পড়লো বাদল। দুটো হাত ওপরের দিকে তুলে—দুটো পা চৌবাচ্চার পাড়ে রেখে।

ভোর রাতে রাস্তায় জল দিচ্ছিলো পাইপে করে। ঘোলা জলে বাদলকে ভিজিয়ে দিয়ে গেল। উঠে পড়ে নিজেকে এবং পরিবেশটাকে ভালো করে দেখে তবে বাদলের মনে পড়লো সব।

ঘুরতে ঘুরতে শেষ অবধি শেয়ালদ' স্টেশান। ঘুমটা শরীর থেকে যায়নি এবং গায়ে পায়ে আলস্য জড়িয়ে ছিল—বাদল শান্টিং-এর একটা গাড়িতে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়লো বেঞ্চে।

ঘুম ভাঙলো যখন তখন গাড়িটা চলছে। ভয় হলো, চেকার যদি টিকিট চেয়ে বসে। কিছুক্ষণ বাদেই ট্রেনটা পৌছলো নৈহাটী জংশন-এ। নেমে পড়লো বাদল। যাত্রীদের দলে গা ভিড়িয়ে সে যখন গেট পেরিয়ে চলে যেতে পারলো, বাদলের মনে হলো, না, ভাগ্য তার ওপর নেহাৎ বিরূপ নয়।

কিন্তু খিদে পাচ্ছে। এখন বেলা বারোটা হবে। বাড়িতে থাকলে খেতে হবে মনে করলেই বিরক্ত লাগতো তার। পথের ধারে খাবারের দোকান। তাতে যে সব খাবার আছে, বালুসাহী, গজা এবং চিরপরিচিত দরবেশ—তাদের কোনদিনও বাদল এমন নিরীক্ষণ করে দেখেনি। এখন খানিকক্ষণ লোভী চোখে তাকিয়ে চলতে চলতে বড় দুঃখে তার মনে হলো, শরীরটা যখন তার রেডিও-এ্যাকটিভ হয়ে গিয়েছে, তখন খিধের অনুভূতিটা আগে মরে যাওয়া উচিত ছিল। তাহলে অনেক সুবিধা হতো। চলতে চলতে পথের পাশে ব্লু এণ্ড

হোয়াইট সিগারেটের একটা ভ্যান, একটা তাঁবু এবং টেবিল-চেয়ার পেতে একটা লোক বিরস মুখে বসে আছে, আর সকলকে ডেকে ডেকে কোকাকোলা খাইয়ে ব্লু এণ্ড হোয়াইটের ছোট ছোট ব্যাজ দিচ্ছে দেখে সে দাঁড়িয়ে গেল। কোকাকোলা ত' কোকাকোলাই ভাল। তাই খেয়ে নিল দু' বোতল। তারপর খালি চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে লোকটার সঙ্গে গল্প শুরু করলো।

কথায় বার্তায় জানা গেল, পায়ে রণ-পা লাগিয়ে ব্লু এ্যাণ্ড হোয়াইটের একজিবিশানিস্ট পুতুল সেজে চলতে হবে, এইরকম কয়টা লোক খুঁজছেন এঁরা। ভ্যানটা চলবে পিছনে। রেকর্ডে বাজনা বাজবে। আর জ্যান্ত পুতুলদের নাচতে হবে। দিন তিন টাকা এবং চাকরী যদিও অস্থায়ী তবু এখন দু মাস চলবে।

শাদা লিবার্টি সার্ট, ব্রাউন কর্ডের ট্রাউজার আর বম্বের কোলাপুরী চটি পরা এরকম সন্ত্রান্ত চেহারার একজন লোক যে এত আগ্রহ করে এসব কেন জানতে চাচ্ছে—তাই বোধহয় ভাবছিল লোকটি। বিকেল নাগাদ আবার যখন ক্ষিদেটা পেটে চিনচিন করে উঠলো তখন বাদল বলে ফেললো—লোক কি পাচ্ছেন না ?

—লোক পাচ্ছি। নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। রণ-পা পরে সবাই চলতে পারে না। পড়ে যায়। পুতুলের মাথা ভেঙে যায়।

—আমাকে নিন না ?

—ঠাট্টা করছেন ?

বাদল হেসে চোখ টিপে বললো—বিশেষ একটা কারণে, বুঝলেন না, আমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হচ্ছে। সে অনেক ব্যাপার। আপাততঃ আমার একটা কাজ দরকার।

তার হাতের অটোমেটিক ওমেগা সী-মাস্টার ঘড়িটার দিকে চাইলো লোকটি। বাদল বললো—আমাকে দিয়ে দেখুন। আর শুনুন, আমাকে কিছু খাওয়ান ত'। আজ খেতে ভুলে গিয়েছি।

প্রথমটায় অসুবিধে হয়েছিলো। তারপরে রণ-পা পুরে চলতে বেশ অভ্যাস হয়ে গেল। এ কাজের নিয়ম হচ্ছে অবশ্য, যখন যেখানে যাবে সেখান থেকেই দু'চারদিনের জন্যে লোক নিয়ে নিতে হবে। কিন্তু বাদলকে বড্ড পছন্দ হয়ে গেল ডেমন্‌স্ট্রেটার ভদ্রলোকের। দিন তিন টাকা করে মেলে। বাদল নিজে খায়, তাঁকেও খাওয়ায়। টাকা জমিয়ে আর একটা জামা আর প্যাণ্ট করিয়ে নিয়েছে বাদল। স্থাবর যা কিছু তার কাঁধে ঝোলানো একটা থলির মধ্যে থাকে। সময়ে অসময়ে তাঁকে টাকা ধার দেয়। কোনদিন বলে—টাকা ক'টা আপনিই রাখুন। আমাকে শুধু খেতে দিলেই হবে।

অতএব ভদ্রলোক বাদলকে ছাড়লেন না। নৈহাটী, কাঁচড়াপাড়া, আরো আরো সব জায়গায় তাঁরা ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন। খাওয়া আর ঘুম ছাড়া অন্য কাজ নেই বাদলের। সারা দিনরাত মনটা খাই-খাই করে। লোভী চোখে চেয়ে থাকে তাঁবুর রান্নাঘরের দিকে। এখন ভাত রান্না হবে, তারপর ডাল রান্না হবে। এই সব ভাবতেও ভাল লাগে।

ডেমন্‌স্ট্রেটার দাশুবাবু তাকে জীবন সম্পর্কেও অনেক অভিজ্ঞতা শেখাচ্ছেন। ফ্যাকাশে রঙ, ছাঁটা গোঁফ, জলভরা বড় বড় চোখ—মাঝে মাঝে পঁচিশ নম্বরের চাবি-ছাপের বোতল কিনে আনেন, বাদল স্টেশান থেকে কসা মাংস কিনে আনে। মাছুরের ওপর বসে দু'এক ভাঁড় খেয়েই দাশুবাবু সেন্টিমেণ্টাল হয়ে যান। বারবার বলেন—এটা বুঝতে বাকি নেই স্যার যে, আপনি নিশ্চয় একটা সম্পত্তি পাবেন-টাবেন। সেদিন যেন ভুলে যাবেন না আমাকে।

কোনদিন তাকে সযত্নে তাসের জুয়া খেলতে শেখান। বলেন—তিন-চারটে ট্রিক শিখিয়ে রাখি—জীবনে পয়সার কষ্ট পাবেন না। লোভ করতে যাবেন না যেন। তাহলেই পুলিশের হাঙ্গামায় পড়বেন। ছোটখাটো আড্ডায় বসবেন, অল্প বাজিতে খেলবেন, দেখবেন দুটো ডাল-ভাত আর হপ্তায় একটা বোতলের খরচা হেসে-খেলে পকেটে আসছে।

দেখেছি, জানলেন ? সে সব অনেক কথা। তবে আপনাকে দেখে আমার বুঝতে বাকি নেই। নিশ্চয় আপনি একটা সাংঘাতিক লোক।

বাদল তাঁর ভুল ভাঙতে চায় না। বলে—সে সব কথা থাক। আপনি আমাকে তাসের কায়দাটা ভাল করে শেখান।

দাশুবাবু বলেন—ভাবছেন কেন! আমি আপনাকে ঠিক ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব। অসুবিধে আপনার হবে না।

এমনিভাবে ঘুরে ফিরে মুর্শিদাবাদের লাইনে বহরমপুরে পৌঁছিয়ে বাদলের চাকরী খতম হয়ে যায়। বহরমপুরে সরকারী প্রদর্শনী বসেছে। মাসখানেক ধরে চলবে। যাবার আগে দাশুবাবু বন্ধুর কাজ করে যান। কেমন করে যেন প্রদর্শনীর একজন কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব বেরিয়ে পড়ে। তাঁর কথায় বাদল চটপট কাজ পেয়ে যায়। প্রদর্শনীতে সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে বিভাগ, সেখানে দাঁড়িয়ে দামোদর বাঁধ ও দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানার মডেল দেখিয়ে দর্শকদের কাছে বিবরণী বলতে হবে। দুই বন্ধুর মিলনের পর খানিকটা নেশা হয় বলেই হোক, বাদলকে ছেড়ে যেতে হবে বলে সেন্টিমেণ্টাল হয়েই হোক, কোন অজ্ঞাত কারণে যাবার প্রাক্কালে দাশুবাবু হিন্দী এবং ইংরেজী বলতে থাকেন। তিনি বাদলকে বলেন—বোতল পর কম্বল বাবুকা কাফি শৌখ হ্যায়। টাইম সে টাইম এক দো বোতল দে দিজিয়ে। বাস্ আপ্‌কা পুরা খেয়াল ঔর মদত উন্‌হী করেঙ্গে।

ঘন রোমাবৃত 'চেহারা স্বনামধন্য কম্বলবাবুকে বলেন—I leave the custody of a very great man to you!

বাদলও ভাবপ্রবণ হয়ে গিয়ে দাশুবাবুর হাত ধরে ছলছল চোখে চেয়ে থাকে। আপাতত সে দাড়ি রাখছে। চেহারাটা তার দার্শনিক দার্শনিক দেখায়।

সরকারী স্টলে দাঁড়িয়ে বাদল সকলকে তারস্বরে দুর্গাপুর এবং দামোদর বাঁধের বিবরণ দিয়ে চলে। রাত হলে হোটেলে খেতে যায়। এবং তারপর দুর্গাপুর আর দামোদর বাঁধের মাঝখানে বেঞ্চি পেতে শুয়ে থাকে। আজকাল সে বিড়ি খাচ্ছে। হোটেলের ভাত খেয়ে বিড়ি খেতে খেতে ছারপোকাদের জাগবার সময়ে ঘুমিয়ে পড়তে যে এত সুখ—তা সে আগে জানেনি।

মাঝে মাঝে কম্বলবাবুকে বলে—আপনি স্যার, দেখছি এখানকার একজন কেউকেটা লোক! দয়া করে এই একজিবিশান ফুরোলে আর কোথাও ঢুকিয়ে দেবেন।

কম্বলবাবু আশ্বাস দেন। বলেন—আপনার কাজের ভাবনা? দুবেলায় এক সের চালের ভাত খান, এখানকার মশায় আপনার ঘুম ভাঙাতে পারে না, ম্যালেরিয়াও ধরলো না। আপনাকে আর কিছু না হোক, ঢুকিয়ে দেব কালেক্টরীতে। ফুটবল আসে?

দুঃখিত হয়ে বাদলকে ঘাড় নাড়তে হয়। কম্বলবাবু বলেন—এই রকম বাঘের মতো চেহারা, ইয়া পায়ের গুলী, ফুটবল খেলেন না?

বাদল ম্রিয়মান হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর বলে—ফুটবল খেললে কি হতো?

—ঢুকিয়ে দিতাম। অফিস কি একটা নাকি? সীজন আসছে। তিন-চারমাসের জন্যে চাকরী হতো। অফিসে সারাদিনে একটিবার সই করে চলে আসতেন। মাস গেলে দিব্যি আশী-পঁচাশী টাকা মাইনে পেতেন—যখন যেখানে ম্যাচ খেলতে যেতেন, তখন সেখানে মাংস লুচি খাওয়াত। ভোফা থাকতেন।

লুচি। ভাবতেই বাদল কেমন যেন হয়ে যায়। ইদানীং প্রচুর খাওয়া, এবং আরো খাওয়া ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না তার। অন্য

কোন ভাল চিন্তা মনে আসে না। রেডিও-এ্যাকটিভ হলে হয়তো এমনই হয়। মাথাটায় সব রকম চিন্তা ঠাঁই পায় না। বাদলের মনে হয়, লুচি-মাংস্ সে কতদিন খায়নি! বাদল বলে—ফুটবল শিখে নিলে হয় না? দেখুন, রণ-পা'এ আমি কি কোনদিন চলেছি? দাশুবাবু কত যত্নে শেখালেন আমাকে। শিখে নিলাম ত'! ফুটবল কি শিখে নিতে পারব না?

কম্বলবাবু হতাশ হয়ে মাথা নাড়েন। বলেন—জন্মকালে খেলেননি, তাই। ও কি চটপট হয়? তা ছাড়া, বলতে নেই, পায়ে গায়ে যে রকম জোর আপনার—বল মারলে বল কোথায় চলে যাবে ঠিক কি? তার চেয়ে বরঞ্চ আপনাকে···দেখা যাক, এসে যখন পড়েছেন—তখন নিরাশ করব না। দাশুবাবু দিলে আপনাকে। দাশুবাবুর কথা কি আমি ফেলতে পারি?

—দাশুবাবুর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব হলো কি করে?

—সে কথা বলবেন না। জানেন, দাশুবাবু একটা যে-সে লোক ছিল না। এই সর্বনেশে যুদ্ধ লাগলো যেবার, সে-বারই ওর সর্বনাশ হয়ে গেল।

কাছে এসে কম্বলবাবু ফিস্ ফিস্ করে বলেন—জানেন, বম্বে গভর্ণমেণ্ট এখনো ওর ওপর খাপ্পা?

বাদল জানে না। কম্বলবাবু আরো কাছে সরে এসে বলেন—বম্বেতে বাঁদর আমদানী করলে কে? ঐ দাশুবাবু।

বাদল চমৎকৃত হয়ে চেয়ে থাকে। কম্বলবাবু সচরাচর এত কথা বলেন না। সাইকেল চালিয়ে একজিবিশানে আসেন। গায়ের জামা খুলে রেখে গেঞ্জি পরে খবরদারী করেন। পারতপক্ষে কথাবার্তা কন না। আজ তিনি বেশ মেজাজে আছেন বলে মনে হয়। বলেন—দাশুবাবু ছিলো বাঁদরের কণ্ট্রাক্টর। তখন যুদ্ধ লাগেনি। জার্মানী আর আমেরিকা ওষুধের জন্যে বাঁদর আমদানী করতো আমাদের দেশ থেকে। টেণ্ডার পড়তো। তিন মাসের মধ্যে চল্লিশ হাজার বাঁদর

চাই—অমনি খবর পড়তো দাশুবাবুর। নিউ মার্কেটের পেছনে চিড়িয়াপট্টিটা দেখেছেন? ওখানে দেখবেন এখনো রুস্তম সায়েব বসে আছে। টকটকে লাল রঙ, দাড়িতে মেহ্‌দী—তার কাছে নাম করে দেখবেন—দাশুবাবুর কদর কত?

—দাশুবাবু কি নিজে বাঁদর ধরতেন?

—দূর মশায়, আপনি এসব ট্রেডের কিচ্ছু জানেন না। দাশুবাবু বাঁদর ধরবে কেন? টেণ্ডার পেলে পরে দাশুবাবু আমাকে নিয়ে বেরিলী যেত। রাজ্যের বাঁদরওয়ালাকে টাকা দিতো। তারপর খাঁচা বোঝাই করে নিয়ে আসতো। আমারও কম উপকার করেনি। মিছে বলব না। বাঁদর পিছু এক পয়সা করে দিতো। সীজনে আমি দু'পাঁচশো টাকা কামাতাম। দাশুবাবুর তখন কি মেজাজ! নিজের ফিটন গাড়ী, কানে আতর, নিত্য থিয়েটার দেখছে আর মাঠে যাচ্ছে। রাজ্যের বুকি আর জকি দাশু মিত্তিরের গ্রেট ফ্রেণ্ড! সে একদিন গিয়েছে! —যাই হোক, দাশুবাবু যুদ্ধের ঠিক আগে জার্মানী থেকে পঁচিশ হাজার বাঁদরের অর্ডার পেলো। রুস্তম সায়েব ত' দাশুবাবুকে ডাকলে, বললে মিত্তির, বিগ অর্ডার, বিগ মানি। সব কিছুর দাম চড়ছে—বাঁদরও মাগ্‌গী হয়ে গিয়েছে। এবার বাঁদর পিছু তোমার দু' টাকা থাকবে। বুঝে দেখুন! পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে দাশুবাবু। তবে রুস্তম এ-ও বললে—আমার ছেলে হজ করতে গেছে। তোমাকে এবার বাঁদর বম্বেতে পৌঁছে দিয়ে জাহাজে তুলে দিতে হবে, বুঝেছ? দাশুবাবু আমাকে টেলিগ্রাম করলে। বললে—কম্বলবাবু, বম্বে অবধি চল। অতটা পথ একলা যাব? কলজেটা বরাবরই মস্ত বড়ো ওর। বললে—কম্বলবাবু, সাত সিকে আমার, এক সিকে তোমার। ভেবে দেখলাম, কোথাও কিছু নেই, ছ'হাজার টাকা পাব! চলে গেলাম।

আমরাও বম্বেতে নামলাম, আর সেদিনই লাগলো যুদ্ধ। সর্বনেশে কাণ্ড। জার্মানীর সে জাহাজ আটকে ফেললো পোর্টে। পঁচিশ

হাজার বাঁদর ক্রেটের ভেতর চ্যাঁচামেচি শুরু করল। হুলুস্থূলু কাণ্ড. হৈ-হৈ ব্যাপার। নিয়ে গেলাম খাঁচাগুলো ইয়ার্ডে। তা রেল কোম্পানি বলে এক্ষুনি খালাস কর। ডকে জাহাজের খোঁজ করতে যাই—পুলিশ ত' জার্মান স্পাই বলে আমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে থানায় রাখলে। এদিকে পঁচিশ হাজার বাঁদর খাবার চায়। তাদের চ্যাঁচামেচিতে অতিষ্ঠ হয়ে রেলওয়ের লোক এল আমাদের কাছে। রেলের বড়কর্তা আমাদের খালাস করে এনে কড়া ধমক দিল। বললে —শিগ্‌গীর বাঁদর খালাস করে নিয়ে যাও। জাহাজ কোম্পানিকে বললাম, তোমাদের মাল, তোমরা দেখ। তারা জবাব দিলে না। এদিকে বম্বের কাগজে কাগজে লেখা হলো আমরা বাঁদরের ওপর নিষ্ঠুরতা করছি। যত জৈন আর বিষ্ণুবাদী ছিলো, সবাই গাড়ি গাড়ি কলা আর টমেটো নিয়ে ইয়ার্ডে ঢুকলো। সিল্কের শাড়ি পরা মেয়েরা সত্যাগ্রহ করে শুয়ে পড়লো। এক মার্চেন্ট ত' গান্ধীজীকে জানাবে বলে শাসালে। শেষ অবধি একটা আন্দোলন বেধে গেল। পুলিশ ওদের ইয়ার্ডে ঢুকতে দেবে না। ওরা ঢুকবেই। শেষ অবধি রেলওয়ের সাহেব, পুলিশের সাহেব আমাদের সঙ্গে যুক্তি করে রাতারাতি খাঁচা খুলে বাঁদর সব সহরে ঢুকিয়ে দিলে। সহরের ইলেক্‌ট্রিক তার বেরিলীর বাঁদর কোন জন্মে দেখেনি। তারা তারের ওপর পড়ে আর দাঁত খিঁচিয়ে মরে পড়ে যায়। শহরের মাড়োয়ারীরা এসে আমাদের শাসালে, তাদের সামনে এমন করে বাঁদর মরলে তারা আমাদের আস্ত রাখবে না।

দাশুবাবুরও মহা নাকাল হলো। শেষ অবধি একটা পয়সা ত পেলই না—উপরন্তু তার করে দেশ থেকে টাকা আনিয়ে কয়েকশো ছোকরা ভাড়া করে, তাদের বাজি-পটকা কিনে দিয়ে, বাজি ফুটিয়ে ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে বাঁদরদের শহর ছাড়া করে এদিক-ওদিক চালান করে দিলে। দাশুবাবুকে বম্বের পুলিশ ওয়ার্নিং দিলে—ভবিষ্যতে দাশুবাবু যেন বম্বে শহরে না ঢোকে। সেবার মহা লোকসান হলো

আর তাতেই দাশুবাবুর কোমর ভেঙে গেল। সে আর দাঁড়াতেই পারল না। তবে আজ অবধি আমি লোকটাকে শ্রদ্ধা করি। হ্যাঁ, পয়সা যখন ছিল, দিয়ে খেয়েছে। একলা নেয়নি। কম্বল সান্যাল আর যাই হোক, বেইমান নয়, জানলেন!

সেই রাতে মাথার কাছে ভিলাই, দুই পাশে দুর্গাপুর আর দামোদর বাঁধ আর পায়ের কাছে ফরাক্কা বাঁধ রেখে মাঝখানে শুয়ে বাদলের ঘুমের মধ্যে খালি হাজার হাজার বাঁদর-পরিবৃত দাশুবাবুর ছলছলে চোখ মনে পড়ে।

•

কম্বল সান্যাল যে কতখানি বন্ধুবৎসল, তা বোঝা যায় এক্‌জিবিশান শেষ হলে পরে। তিনি একদিন বলেন—লেখাপড়া যদি জানতেন, তাহলেও না হয় ঢুকিয়ে দিতাম সেটেলমেণ্টে।

সে লেখাপড়া জানে না, এ কথা কম্বলবাবু ভাবলেন কি করে? বাদল বলে—লিখতে পড়তে জানি ত'!

—জানেন? হাতের লেখা ভাল?

বাদল বলে—চলনসই। কিন্তু কেন, কম্বলবাবু?

কম্বল সান্যাল তার সম্পর্কে হীন ধারণার জন্য লজ্জিত হন। বলেন—না না, লিখতে পড়তে জানবেন না কেন? দাশুবাবুর বন্ধু যখন। কি জানেন? আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। তিনি বলেন—ডিষ্ট্রীক্ট সেটেলমেণ্ট এবার তিনশো ছেলে নেবে। যত সাতকেলে পুরনো দলিল, সে সব বস্তা বোঝাই পড়ে রয়েছে। সেগুলো কপি করাবে। প্রত্যেক বছরই করায়। আপনাকে আমি ঢুকিয়ে দেব। মাসে মাসে সত্তর-পঁচাত্তরটা টাকা দেবে। যাদের যাদের ঢুকিয়ে দিই, তাদের কাছ থেকে আমি মাসে মাসে গোটাদশেক টাকা নিই। তবে আপনার কথা স্বতন্ত্র। বুঝলেন। আপনি এখানে ঢুকুন। ততদিনে গঙ্গায় জল কমতে থাকবে।

—গঙ্গায় জল কমতে থাকবে ?

কম্বল সান্যাল রহস্যময় হাসি হেসে বলেন—দেখবেন তখন ! কাজ কতরকম হয়। আর আপনাকে দেখে ত' আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে মশাই। বাঙালীর ছেলে, এই স্বাস্থ্য, এই চেহারা—দেখলেও ভাল লাগে। কিচ্ছু ভাববেন না, আপনার পিছনে আমি আছি।

অতএব একজিবিশান ফুরোতে না ফুরোতে সেটেলমেণ্টের কাজে ঢুকে পড়ে বাদল। যতই দিন যাচ্ছে, ততই তার বাঁচতে ভালো লাগছে। এই ভালো লাগা এক অবিমিশ্র অনুভূতি নয়। পূর্ব জীবন আর তখনকার পরিচিত মানুষগুলির কথাও তার মনে হয়েছে। প্রতিমার কথা মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, বাঁচতে কত সামান্য উপকরণ লাগে। এই ত' বাংলার একটা মফঃস্বল শহরে এসে সে ত' কাটিয়ে দিল এতোগুলো দিন। মাথার ওপরে একটা আশ্রয় লাগে, আর দুবেলা আহার। এতেই ত' সুখে থাকা যায়। যদি এই জীবনটা সে আর একবার ফিরে পেত, যদি সামনে ঐ রকম একটা শাসনের তর্জনী না থাকতো—তা হলে প্রতিমাকে নিয়ে এইরকম কোন জায়গায়, এমনি শান্ত পরিবেশে সুখে থাকতে পারতো। তার কেন যেন বিশ্বাস আছে, প্রতিমা এই সহজ, নিরলঙ্কার নিরুপকরণ জীবনের মর্য্যাদা দিতে পারতো। সে অভিযোগ করত না। সুখী হবার জন্য চাই ভালবাসবার মন। প্রতিমার ত' সে মনটা আছে।

আবার একটা নির্লিপ্তভাও এসেছে মনে। এ-ও মনে হয় যে, প্রতিমা সুখী হোক, তাকে ভুলে যাক—যদি কোনদিন মনে করে তবে যেন সে স্মৃতিতে কোন জ্বালা না থাকে।

যতদিন হিসাব করে বেঁচেছে বাদল, ততদিন জানেনি জীবন কত সুন্দর। এখন কত সময়, কাজের অবসরে পথের ধারে বড় বড় গাছগুলির নিচে বসে কেটে যায় তার। কি সুন্দর ছায়া-ঢাকা গাছ-গুলি ! তার নীচে সাঁওতাল পরিবারগুলি কেমন অস্থায়ী বাসা বেঁধেছে। গাছের গায়ে ঝুলিয়েছে হাঁড়ি, ঝুড়ি, ছোট ছেলের দড়ির

দোলনা। গাছের নীচে বসে তারা রান্না করছে, মা ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে, পুরুষরা বাঁশ চেঁছে ঝুড়ি-টুকরি বানাচ্ছে, ছোট ছেলে-মেয়েরা ফাঁদ পেতে পাখী ধরছে।

এই সব দেখবার মধ্যেও শান্তি আছে, আনন্দ আছে—সে আনন্দের স্বাদ আগে জানেনি বাদল।

সেটেলমেণ্টের অফিসে পুরনো দলিল কপি করে বাদল। সন্ধ্যা হলে কখনো গঙ্গার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। গঙ্গার এপার থেকে ওপারে সূর্যাস্ত শেষ অবধি দেখা যায়। একটি দিন গেল মানে তারও দিন একটি কমে গেল। এখন কিন্তু সে চিন্তায় তার দুঃখ হয় না। মনে হয়, ভালই হয়েছে। এখন মৃত্যুকে সে অনেক সহজে গ্রহণ করতে পারবে।

এই কাজে কাটে তিনমাস। ততদিনে গঙ্গার জল কমতে শুরু করেছে। কম্বল সান্যাল বলেন—এবার আপনাকে ব্যারেজের কাজে দেব। শুনুন, গঙ্গায় ত' বাঁধ পড়বে না। এখন যখন জল কমবে, তেমনি জলের দাগ মাপতে হবে। নেহাৎই অস্থায়ী কাজ। তিন-চার মাসের। কিন্তু ততদিনে আবার একটা কিছু জুটে যাবে।

বাদল বলে—আমিও ত' অস্থায়ী। জল কমে জল বাড়বে আবার জুন জুলাই-এ। তখন আমি কোথায়?

—তখন পালাবার মতলব করছেন? ওকথা ভাববেন না। এখান থেকে ভাল কাজ দেখলে আপনাকে ডকে ঢুকিয়ে নেবে ডকমাস্টার। খিদিরপুরে কাজ পেয়ে যাবেন।

বাদল একথা বলে না যে, সে আর আগামী জুন-জুলাই দেখবে না। সান্যাল বুঝতে পারবেন না। কম্বলবাবু বলেন, আপনাকে আমার এত পছন্দ হয়ে গিয়েছে যে, ইচ্ছে যাচ্ছে চিরদিনের মতো আপনার লোক করে রেখে দিই। কি করবো, নিজের বলতে কেউ নেই। আর, আর, আপনি ত' আমার স্বজাতি নন।

বাদল বলে, সে দুঃখ করে কি আর হবে বলুন? তার চেয়ে আসুন তাস খেলা যাক।

গঙ্গার জল কমতে বাদল জল মাপবার কাজে ভর্তি হয়ে যায়। নেহাৎই রোদে পোড়বার এবং জলে ভিজবার কাজ। জল নামছে, পাড়ে কাদা জমে আছে—গঙ্গার নরম কাদা—পা ডুবে যায়, সেখানে গজ-ফুট মেপে হাঁকতে হয়। বাদলের কাজ দেখে অফিসার ভারী খুশি। তিনি বলেন—ডকমাস্টার আমার নিজের লোক। আপনার মতো লোক পেলে সে এখনি নেয়। আপনি এখানে এই কাজে এলেন কেন?

—ভাসতে ভাসতে।

অফিসার বলেন—আমাদের ডকমাস্টার শুধু ভাল স্বাস্থ্য আর সবল শরীরের বাঙালী ছেলে চায়। আপনাকে একবার নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলে হয়। দেখলেই কাজ দেবে।

বর্ষা পড়লে গঙ্গায় যখন জল ভরে ওঠে, তখন বাদলের কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

বাদল চলে যাবে জেনে কম্বল সান্যাল মর্মাহত হয়ে যান। বারবার বলেন—থাকুন এখানে, কাজ আমি আপনাকে আবার দেব জুটিয়ে। ভাবছেন কেন?

বাদল তাঁকে সব বলতে পারে না।

তার আর কম্বলবাবুর বিদায় গ্রহণটাও সেন্টিমেণ্টাল হয়ে যায়।

কম্বলবাবু বলেন—ভাই, যাচ্ছেন ঠিকই। তবে প্রাণটা আমার কেড়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

শেষ অবধি এখান থেকে তাকে নিয়ে যান অফিসারটি। বলেন—কাজ নাই করলেন, লঞ্চে করে সোজা কলকাতা চলুন! চমৎকার লাগবে। ট্রেনে ত' কতই চড়েছেন। এ রকম নদী দিয়ে গিয়েছেন কখনো?

বাদল বলে—কাজ দেবেন না বলছেন কেন? ডকে যদি নিয়ে ফেলতেই পারেন, তাহলে কাজও একটা দিতে হবে।

মনে ভাবতে মন্দ লাগে না। কলকাতাতেই খিদিরপুরের ডকে সে কাজ করবে, অথচ সে কথা তার পরিচিত কেউ জানতেও পারবে না—খানিকটা মজাও লাগে।

অফিসারটি বলেন—আগে থেকে বলি। ডকের কাজে ছুটি নেবেন না। আপনার স্বাস্থ্য আছে, দুই শিফ্‌টে কাজ করবেন। ডকের কাজ মানে ত' মাল ওঠাবেন আর নামাবেন। ওভারটাইমে প্রচুর পয়সা। আর খাটতে পারে না বলে বাঙালীর ছেলেদের এত বদনাম। মনে হয়, আপনাকে দেখলে আমাদের সেন সাহেবের সে দুঃখ ঘুচবে। কি চমৎকার অফিসার দেখবেন! যেমন রাশভারী, তেমনই সহৃদয়। ভারী পছন্দ করে সবাই। আপনাকে এত কথা বলছি এই কারণে যে, কাজ করতে করতে আপনাকে মনে ধরে গেলে ওখান থেকে সরিয়ে এনে ভাল পোস্টে দিয়ে দেবেন। এ রকম উনি অনেককে করে দিয়েছেন।

কাঁচামাল, খাদ্যদ্রব্য আরো নানারকম জিনিষ লক্ষ লক্ষ টন এই পোর্ট থেকে বাইরে যাচ্ছে, বাইরে থেকে আসছে। ডকের ভেতরকার জীবনটার সঙ্গে বাইরের দুনিয়াটার যেন কোন যোগাযোগ নেই।

এখানে এসে বাদল এমন একটা জীবনের মধ্যে পড়ে যে, দিন-রাত্রির হিসেব থাকে না। বাদল যে কাজটা করে, তারও একটা নাম আছে। তবে কাজটা কুলী খাটাবার। হাজার হাজার কুলী প্রত্যহ লাইন বেঁধে মাল আনছে, ক্রেনে তুলছে—জাহাজে বোঝাই করছে। আবার ক্রেন থেকে খালাস করে যান্ত্রিক ছন্দে নিয়ে এসে বোঝাই করছে অপেক্ষমান ট্রাকে, লরীতে। এক নাগাড়ে আট ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বাদলকে। চওড়া বুকটা ঘামে ভিজে যায়। শার্টের কলার খুলে দেয়। এক শিফটের পর ডকের ক্যান্টিনে বসেই খেয়ে নেয়। তারপর আর এক শিফট্ নেয়। ডকেরই এক পাশে তার কোয়ার্টার। সেখানে যখন পৌঁছয় রাত বারোটার, তখন সমস্ত শরীরটা ঢেলে ঘুম আসে।

অফিসার বলেন—নাগ, তুমি ছুটি নাও না কেন?

বাদল বলে—দরকার নেই।

অন্যান্য সহকারীরা বাদলকে প্রথমে সন্দেহের চোখে দেখেছিল। ভেবেছিল, এ অন্যান্যদের মতো কাজ দেখিয়ে খুশী করছে অফিসারকে। সুযোগ পেলেই সরে যাবে এখান থেকে। চলে যাবে মধ্যবিত্ত ভদ্রতার নিরাপদ আশ্রয়ে।

বাদলের মধ্যে সে রকম কোন অভিরুচি দেখা গেল না। বরঞ্চ তার সঙ্গে মেলামেশা করতে চেয়ে অফিসারই ক্ষুণ্ণ হলেন। সে স্পষ্টই বললো—কুলীমজুর খাটাই, আমি কি আপনার সঙ্গে মিশতে পারব? সে আপনার ভাল লাগবে না। আমারও অসুবিধা হবে।

বাদলের সহকারীদের জাত আলাদা—তাদের মধ্যে আদান-প্রদানের অন্য ভাষা, অন্য ব্যবহার। বাদলও তাদের সঙ্গে নোংরা হাতে কলাই করা মগে গরম চা খেল। ছুটিছাটায় তাদের সঙ্গে বসে তাসের জুয়া খেলে হেরে বা জিতে মারামারি করলো। কোনদিন বা মৌতাতের আসরে নিজেই চাটগাঁ ও নোয়াখালির মানুষদের সঙ্গে মাংসের ভাজাভুজি বানালো। আর এদের প্রয়োজনে, গলায় রুমাল বেঁধে মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে যাবার সময়ে, কোথাও পুলিশ কেসে বেকায়দায় পড়ে গেলে অকাতরে টাকা ধার দিল।

ইয়াসিন আর আকবর, সিতারী আর অ্যালবার্ট সবাই একসঙ্গে রায় দিল—হ্যাঁ, বাবু হতে হয় তো বাদলবাবুর মতো। এমন কলিজা আর কারু হয় না।

ইয়াসিন, যে আট বছর বয়স থেকে তার নিজের দেশ চাটগাঁ ছেড়েছে—যে জাহাজে জাহাজে কম করে চল্লিশবার বিলেত গিয়েছে আর এসেছে—চারটে বন্দরে, দুনিয়ার চারটে জায়গায় যার বৌ আছে—এবং কয় বছর আগে এডেনের বন্দরে এক খুনের মামলায় জড়িয়ে যে এখন ভাল ছেলে হয়ে এখানে কাজ করছে, সেই ইয়াসিন প্রায়ই বলে—বাদলবাবু, কলিজাটা কোথায় পেলে?

—মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়েছিলাম, খোদা ওপর থেকে টুপ করে ফেলে দিলো, বুকে ধরে নিলাম।

ইয়াসিন তাকে বলে—এখানে আর কি জীবন? চল আমার সঙ্গে এডেন, কায়রো, ডার্বান, কেপটাউন—তোমাকে লাইফ দেখাব। কি হোটেল, আর কি সব মেয়ে! বাদলবাবু, যদি সাতটা সমুদ্রের জল না খেলে, আর মার্সাই, লিস্‌বন আর কাসাব্লাঙ্কার পোর্টে ফুর্তি না করলে, তবে আর কি করলে? জীবনটাই তোমার আধখানা রয়ে গেল।

ইয়াসিন এক একদিন বলে—কিছু টাকা জমিয়ে নাও—আমারও আছে কিছু টাকা—চল তুমি আমি বার্সিলোনা চলে যাই।

—তারপর আমাকে ছুরি মেরে ফেলে দাও আর কি মাঝ দরিয়ায়!

জিভ কাটে ইয়াসিন। বলে—এই কথা বলছো! কেন, সেই প্রথম তাসের আড্ডার দিনই তোমার সঙ্গে আমরা ছুরি ক্রস্‌ করে নিলাম না? Sea man, bad man, but not বেইমান। জানলে? এই কথাটা তুমি মনে রেখ।

ডকে গোলমাল লেগেই থাকে। কাজ নিয়ে গোলমাল, বাট্টা দেবার সময় গোলমাল, অসুস্থ হলে ছুটি নিয়ে গোলমাল। বাদল বিচক্ষণের মতো তাদের হয়ে কথা বলে—মীমাংসা করে দেয়। অ্যালবার্ট বলে—তুমি বাদলবাবু, তুমি হচ্ছ সসেজ কাটবার ছুরি, এদিকেও ধার, ওদিকেও ধার। দুদিকেই ঢুকে গিয়েছ একেবারে মনের ভেতরে।

বাদল হাসে। এদের সঙ্গে মিশে সে যে শুধু বাঁচবার স্বাদ, জীবনের স্বাদ পাচ্ছে তাই নয়, নিজেকে সে একেবারে ভুলতে পেরেছে। নিজের কথা আর তার মনে পড়ে না।

আমেরিকা থেকে গম এসেছিলো কয়েক হাজার টন। নামাবার সময়ে বিপত্তি ঘটলো। ক্রেনের কি একটা মেরামতের কথা নিয়ে

কয়েকদিন ধরেই কুলীরা হাঙ্গামা করছিল। ইয়াসিন বলছিলো—
—একদিন এবার হবে একটা এ্যাক্সিডেণ্ট বাদলবাবু, তুমি বল না কেন ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে ?

গোলমালটা হলো শেষ শিফ্‌টে। রাত তখন এগারোটা হবে। ক্রেন ছিঁড়ে বস্তা পড়লো—প্ল্যাটফর্ম কেঁপে উঠলো, আর বাদল অতর্কিত এই বিপদের জন্যে প্রস্তুত ছিল না বলে—কুলী দুজনকে নিচে ফেলে যন্ত্রের খাঁচাটা ওপর থেকে আছড়ে পড়লো তার পায়ের ওপর।

তারপর হৈ চৈ, গোলমাল, অফিসাররা ছুটে এলেন। আলো জ্বলে উঠলো আশেপাশে—বাদল অচৈতন্য হয়নি, তবে মনে হলো মাথা থেকে পা পর্যন্ত যন্ত্রণার অনুভূতিটা গরম হয়ে গলে গলে নামছে। বাদল বুঝলো—রক্ত পড়ছে।

কপালে কয়টা আর পায়ে কয়টা সেলাই নিয়ে হাসপাতালে পড়ে রইলো বাদল কয়দিন। বন্ধুরা সমবেদনা জানিয়ে বললো—ষাঁড়ের মতো গর্দান তোমার বাদলবাবু, নইলে ওই দত্তবাবুর ক্রেন তোমার মাথাটি নিয়ে নিত।

হাসপাতাল থেকে সে ছাড়া পেতে সেন সাহেব এলেন। বললেন—এবার আমাদের ডাক্তারের কাছে সার্টিফিকেট লিখে ছুটি করিয়ে নিন। কোথাও যাবার না থাকে হোটেলে গিয়ে না হয় থেকে আসুন পনেরো দিন। ছুটি আপনি এমনি পাবেন। কাজ থাকবে—ভাবছেন কেন ?

অগত্যা ছুটির সার্টিফিকেট লেখাতে ডাক্তারের কোয়ার্টারে গেল বাদল। নতুন কোয়ার্টার। সামনে ডাক্তারের বসবার ঘর। কাঁচের ভারী পাল্লা ঠেলে ঢুকলো বাদল।

বললো—আমার স্যার সার্টিফিকেটের ব্যাপার। তাড়াতাড়ি দেবেন ত' !

—নাম।

বলে ডাক্তার মুখ তুলতে, ঘর ভর্তি লোকজন, অপেক্ষমান আরো খালাসী, সারেং, কুলী সবাইকে টপকে—টেবিলটা উল্টে ফেলে বাদল ডাক্তারের ওপর গিয়ে পড়লো। বললো—হতভাগা, তুমি?

হিমাদ্রি তাকে ছাড়াতে পারে না। অতিকষ্টে দম নিয়ে, সে চেয়ে রইলো; যেন ভূত দেখেছে। বললো—বাদল!

—হিমাদ্রি!

—বাদল!

দুজনে দুজনকে আবার জাপটালো। হিমাদ্রি বললো—মরে গেলাম। ছাড়ো, ছাড়ো। ইস্, কি শরীরই বানিয়েছ।

বাদল তখন ডেস্ক ক্যালেণ্ডারটা দেখল। দেখে চোখ বুজল। আবার চাইল। না। ভুল নেই কোন। লাল অক্ষরে মে মাসের তিন তারিখ দিব্যি জ্বল্‌জ্বল্ করছে। সে ষাঁড়ের মতোই চেঁচিয়ে উঠলো—তবে যে আমার এপ্রিল মাসে মরবার কথা ছিল?

হিমাদ্রি বললো—বাদল শান্ত হও, বলছি।

—শান্ত হবো? রাস্কেল, ইডিয়ট, তুমি যে বলেছিলে?

হিমাদ্রি বললো—বলতে দেবে ত'? শোন বাদল, ওটা একটা চূড়ান্ত ভুল হয়েছিল।

—ভুল হয়েছিল?

বাদল এবার কাঁপতে শুরু করলো। বললো—ভুল মানে?

—ডাক্তার দেশমুখ একটি Hoax! ওঁর সব থিওরী বাতিল হয়ে গিয়েছে! আসলে তোমাকে ধরেছিলো জেলিফিশে। জেলিফিশ ধরলে ওরকম হয়। তখন যদি কোনো হুলিয়া দেখতো, সেই

ত পারতো।

বাদলের মুখ রক্তের চাপে কালো হয়ে গেল। সে শক্ত পাঞ্জায় হিমাদ্রির হাত চেপে ধরলো, বিকৃত গলায় বললো—তার মানে?

—তার মানে তুমি রেডিও-অ্যাকটিভ নও। ওটা একটু ভুল। এ রকম ভুল অবশ্য···আর তাতে আমারও একটু হাত ছিল বৈকি!

প্রতিমার যে রকম মন হয়েছিল—তোমাকে একটু মানুষ করা দরকার, তাও আমার মনে হয়েছিল। আর রেডিও-অ্যাকটিভের ঐ থিওরীটাই ত' ভুল। সবই তুমি জানতে পারতে—তবে তুমি সেই কোথায় নিরুদ্দেশ হলে—তোমার নামে কাগজে বিজ্ঞাপন অবধি দিয়েছিলাম, দেখনি ?

বাদল তার হাত চেপে ধরে বলে—তুমি আমাকে ধাপ্পা দিয়েছ এতদিন ধরে ?

হিমাদ্রি কাতর শব্দ করে। বলে—বাদল, হাতটা আমার ভেঙে গেল।

—প্রতিমা কোথায় ?

বাদল এবার প্রায় গর্জন করে উঠলো। যন্ত্রণায় হিমাদ্রির চোখে জল এসে গেল। বললো—কোথায় আবার, ওপরেই আছে। তিনমাস ধরেই আছে। কিন্তু বাদল···

তিনমাস ধরে প্রতিমা এখানে আছে! আর এই ডকে মাত্র আধমাইল দূরে বাদল এই তিনমাস কাটিয়েছে ? বাদল হিমাদ্রিকে এক ধাক্কায় ফেলে দেয়। প্রতিমা! প্রতিমা! —বলে ডাকতে ডাকতে সামনের দেয়ালে ধাক্কা খায়। দরজা নেই। সে টক্কর খেয়ে মাতালের মতো ঘুরে গিয়ে সামনের লন দিয়ে ছোটে। দরজা ঠেলে ঢুকে, সিঁড়ি দিয়ে ডাকতে ডাকতে ওঠে ওপরে।

প্রতিমা বসে ছিলো, সামনে আরো কেউ ছিলো, কোনদিকে তাকায় না বাদল। প্রতিমাকে জড়িয়ে ধরে। প্রতিমা, আমি এসেছি—এ ছাড়া আর কিছু সে বলতে পারে না। প্রতিমাকে একবার জড়ায়, একবার একটু দূরে সরিয়ে দেখে—আবার তাকে জড়িয়ে বাদল শুধু বলে—প্রতিমা !

প্রতিমা আশ্চর্য হয়ে হেসে, তারপরে কেঁদে ফেলে।

বাদল বলে—কেঁদ না প্রতিমা। হিমাদ্রি একটা ইডিয়ট। কিন্তু তুমি প্রতিমা—বাদলের যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

এতক্ষণে চোখে পড়ে মোটা সুপ্রিয়কে। বাদল প্রতিমাকে ছেড়ে এবার তাকে তাড়া করে। বলে—আবার এসেছ তুমি? বলেছিলাম না তোমাকে? বলিনি যে, প্রতিমার দিকে তাকাবে না?

সুপ্রিয় বলে—এই ক্ষমা চাইছি বাদল।

—ক্ষমা চাইছ? বেরোও, বেরিয়ে যাও।

সুপ্রিয়কে ঠেলা দিয়ে বের করে দিয়ে বাদল বুক ফুলিয়ে প্রতিমার সামনে দাঁড়ায়। বলে—ঐ ইডিয়টটা তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল?

প্রতিমা কথা বলতে পারে না।

বাদল বলে—প্রতিমা, আমি এসেছি। এখনো তুমি কাঁদবে?

প্রতিমা কাঁদতে চায় না. তবু কাঁদে! কথা কইতে চায়, কথা কইতে পারে না। অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলে বলে—কেন এমন করে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলে? তোমাকে আমি কম খুঁজেছি?

বাদল এবার হাসতে শুরু করে। এত হাসে যে, প্রতিমাও এবার চোখের জলের ভেতর দিয়েই হাসে। তারাপর বাদল বলে—এবার তুমি কিন্তু আমাকে আর যেতে দিও না। বুঝলে?

প্রতিমা মাথা নাড়ে।

কিছুক্ষণ বাদে, বাদলের বুকের কাছে ফিসফিস করে প্রতিমা বলে—তুমি কিন্তু আগে একবারও বলনি যে, প্রতিমা, আমি তোমাকে ভালবাসি। যদি বলতে, তাহলে কি যেতে দিতাম?

—বলিনি বুঝি? কি আশ্চর্য।

নিজেকে ছাড়িয়ে বাদল এবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। চুলটা আঙুল দিয়ে ঠিক করে নিয়ে, শার্টের বোতাম আটকে, নতজানু হয়ে বলে—প্রতিমা, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করছি। তুমি রাজী আছ?

প্রতিমাও গম্ভীর হয়ে যায়। বলে—হ্যাঁ।

সুপ্রিয় পেছন থেকে বলে—আমি এ প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন করছি।

বাদল এবার হাসে। বলে—হিমাদ্রি কোথায় ?

—তার হাত মচকে গিয়েছে। সে লোশন লাগাচ্ছে।

প্রতিমা বলে—দাদার কি হলো ?

বাদল বলে—কিছু না। সুপ্রিয়, তুমি গিয়ে হিমাদ্রিকে দেখ। শোন প্রতিমা, এদিকে এস, আমার এইখানে ভীষণ ব্যথা—তোমাকে আগে বলিনি।

—কোথায় ?

বাদল বলে—কাছে এস, নইলে দেখতে পাবে না। আর শোন, এখন কোন কথা বলো না, চুপ করে থাকো, বুঝলে ?

—কিন্তু—

—কাছে এসো, চুপ করে থাকো, তাহলেই বুঝতে পারবে।

প্রতিমা এতটুকু অবাধ্যতা করে না।

শৈবাল লতা

গ্যাসপোস্টটার বাঁ দিকে শিরীষ গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে শিউলী দাঁড়িয়েছিল। রাত বাড়ছিল। রাস্তা দিয়ে পাহারাঅলাটা আর হাঁটছে না। নেপালী গার্ডটা লাঠি ঠুকে ঠুকে চলে গেছে। ওপাশে লাল বাড়ীটার ছাদের ওপর থেকে উঁকি মেরে চাঁদ শিউলীকে দেখছিল।

অপেক্ষার ভংগীতে একটা মানুষ-পুতুল। বুকটা একটু একটু ফুলে উঠেছে। চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। নইলে মনে করা চলতো কোন খামখেয়ালী শিল্পী একটি অপেক্ষারত নারীমূর্তির পুতুল তৈরী করে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

শিউলী হাতের পুঁটলিটা অনুভব করলো।

অনিল বলেছিল—রাত একটার সময়ে তুমি ঐ শিরীষ গাছটার কাছে দাঁড়িও। আমি আমার বন্ধুর গাড়ী নিয়ে আসব। আমার বন্ধুকে এ পাড়ায় সবাই চেনে। তার গাড়ী দেখলে কেউ সন্দেহ করবে না। আজকের রাতটা আমরা তার বাড়ীতেই থাকব। কাল আমাদের বিয়ে হবে। রেজিস্ট্রারের সামনে। তারপর চলে যাব পাইকপাড়া। তোমার বয়স উনিশ পুরে গেছে। যদি পুলিশে কোন হাংগামা করে, কিছুই করতে পারবে না। রেজিস্ট্রারের সামনে বিয়ে হবার অনেক সুবিধে, বুঝেছ।

শিউলী রাত একটার সময় থেকে তাই দাঁড়িয়ে আছে। তার অভিভাবক স্ত্রীলোকটিকে ভুলিয়ে ঘুম পাড়াতে তার কম কষ্ট হয়নি। হরিদাসী যখন ঘুমিয়ে পড়লো, তখনো শিউলী বসে ছিল। তারপর, রাত যখন বারোটা বাজল, তখন সে কাপড়চোপড়গুলো গুছিয়ে নিল। কানে দুটো ফুল আর আঙুলে আংটি ছাড়া আর কোন গয়না তার ছিল না। এই গয়নাগুলো নেবার সময়ে তার একথা মনে হয়েছিল,

হরিদাসী উঠে চ্যাঁচামেচি করতে পারে। আবার এ কথাও সে ভেবেছিল, সে মাসের পর মাস রায়েদের বাড়ীতে কাজ করে যে টাকা পেয়েছে, সবই হরিদাসীকে এনে দিয়েছে। তাই, এই গয়নায় তারও অধিকার আছে।

অনিল বলেছিল, বিয়ের পর তাকে চুড়ি এবং হার দেবে। সে অনিলের প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করেছে। এখন অনিল আসবার সময়টা পেরিয়ে যাবার অনেক বাদেও অনিলের কথাগুলো তার কানে বাজছিল। সে প্রত্যেকটি কথা যেন শুনতে পাচ্ছিল। অনিলের গলাটা খুব সাধারণ। কিন্তু কথা বলবার ভঙ্গীতে বিশিষ্টতা আছে। আস্তে, আদর করে, মিষ্টি মিষ্টি কথা অনিল বলতে পারে।

যেমন, তার মনে পড়লো—

—শিউলী, তোমাকে আমি একটা সম্মানের জীবন দেব। জানি, এদের বাড়ী ছেড়ে গেলে আমাদের কিছুদিন অসুবিধে হবে। কিন্তু আমি চালিয়ে নিতে পারব। এই কলকাতা শহরে, ইচ্ছে থাকলে, চেষ্টা থাকলে একটা কাজ জুটিয়ে নেওয়া এমন কিছু নয়।

—তোমার জাত কি, কোথায় তোমার জন্ম, সে সব প্রশ্ন আমাকে এতটুকু পীড়িত করে না। আমি বিশ্বাস করি তুমি খুব পবিত্র। খুব সাদা মানুষ। আমি আর তুমি সুখী হতে পারব।

—আমরা সুখী হতে পারব। কেন না, যারা সাদাসিধে সাধারণ মানুষ, যাদের চাহিদা কম, তারাই সুখী হতে পারে। যাদের চাহিদা বেশী, যারা অনেক কিছু চায়, তাদের পক্ষে সুখী হওয়া খুব মুস্কিল। তুমি নয়নকে দেখেছ। নয়ন আজ ছোটমামার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে—ছোটমামা তার সম্পর্কে অবিচার করেছে। এ কথা সত্যি। তবু ঐ নয়ন, অন্য কোথাও গেলেও সুখী হতে পারত না। ওর জ্বালা, ওর ক্ষোভ ওকে নিশ্চয়ই অস্থির করে তুলত।

—আমি তোমাকে সুখী করব। আর, এই সংসারে ছোট থেকে বড় হয়ে আমি যে নোংরামি, লোভ, ইতরতা দেখেছি, তাতে টাকা-

পয়সার ওপর আমার বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে। অনেক টাকা-পয়সা ছাড়াই আমি সুখী হতে পারব।

—শিউলী, আমাদের জীবনটা কেমন হবে, সে কথা কি তুমি কখনো ভাব?

শিউলী ভেবেছে। সে সংসারে একখানা ঘরে তাদের খাট, বিছানা, বাসনপত্র থাকবে। সে সংসারে একজন পরিশ্রম করবে বাইরে, একজন ঘরে। খুব সামান্য সম্বল নিয়েই সেখানে সুখী হওয়া চলবে।

রাতের রাস্তাটাকে চম্‌কে দিয়ে একটা গাড়ী ছুটে গেল। শিউলী সোজা হয়ে দাঁড়াল। অদ্ভুত চেহারা নিয়ে চাঁদটা ওপরে উঠেছে। অনিল এল না।

অনিল এল না। অনিল আমাকে ঠকাল।

শিউলী ঘরের দিকে পা বাড়াল।

বন্যা নয়, জীবনের ঢেউ-ই শিউলীকে ভাসিয়ে এনে ফেলেছিল হরিদাসীর কাছে।

হরিদাসী বলে, সে তীর্থে গিয়েছিল। কলেরায় মরা মা-র কোলে একটা ছোট মেয়েকে দেখে তার মায়া হয়, তাই সে তাকে কুড়িয়ে নিয়ে আসে।

এর চেয়ে বেশী কৈফিয়ৎ কারুকে দেওয়া সে প্রয়োজন মনে করেনি। কেউ তার কাছে জানতেও চায়নি। অন্ততঃ এ কথা কেউ বলেনি, এই রকম রং ও চেহারার মেয়েকে সাগরতীর্থে কুড়িয়ে পাওয়া যায় না।

হরিদাসী নার্সিং হোম-এর ঝি ছিল। লেডি ডাক্তারটির নার্সিং হোমে যারা আসত, তারা সবাই শিশুকে নিয়ে ফিরতে চাইত না। অথবা, কিছু টাকার সঙ্গে সেই অবাঞ্ছিত শিশুর ভারও নার্সিং হোমকে

দিয়ে তারা সরে যেত। হরিদাসী-ই এইসব গল্প করেছে পাড়ার লোকের কাছে।

শিউলীকে তেমনি করেই কেউ ফেলে গিয়েছিল কিনা এ প্রশ্ন অনেকের মনে জেগেছে।

অথচ, হরিদাসী সত্যি কথাই বলেছিল।

কালো পাড়ের ধব্‌ধবে সাদা শাড়ী-ব্লাউস পরে লেডি ডাক্তার-এর নার্সিং হোমে আয়াগিরি করলেও হরিদাসী মনে মনে অত্যন্ত গেঁয়ো এবং ধর্মবিশ্বাসী ছিল।

ডক্টর মিসেস দত্ত তাকে বলতেন, হাতে মাদুলি বেঁধ না। বোন মরেছে বলে ভূতের ভয়ে কোমরে লোহার জাঁতি বেঁধে ঘুর না। হরিদাসী তাঁর কথা শুনত না।

একবার বোনঝির সঙ্গে সাগরসঙ্গমের মেলায় যাবার শখ হলো তার।

বাস থেকে নেমে ক্যাম্পের দিকে এগোতে এগোতে সে ঐ সুন্দর সুবেশ ছেলে মেয়ে ও বাচ্চাটিকে লক্ষ্য করেছিল।

তার অভিজ্ঞ চোখে বুঝে নিতে দেরী হয়নি যে, এদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলেছে।

সে মেয়েটির কথা শুনেছিল। মেয়েটি বলছিল—হ্যাঁ। তোমাকে আমি জানি। তুমি একে মেরে ফেলতেই চাও। নইলে রাঁচি থেকে পাটনা, পাটনা থেকে কলকাতা, এ রকম পাগলের মতো ঘুরে বেড়াবার কি অর্থ হয় বুঝিয়ে দিতে পার? আমি কি জানি না, এখন তোমার জামসেদপুর ফিরে যাবার সাহস নেই? আমি কি জানি না, আমাকে বিয়ে করতে তুমি ভয় পাচ্ছ?

—বাজে কথা বলো না জয়া।

—আমি বাজে কথা বলি না কুমার। আমি তোমাকে মুক্তি দিতে চাই। তুমি এখনি, এই মুহূর্তে আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পার। যতদূরে যেতে চাও, যাও। জামসেদপুরেও যেতে পার।

আমি সেখানে কোনদিন যাব না। তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। তুমি কি জান না, আমাদের সমাজে পুরুষদের কোন দোষ নেই?

এই সব কথা কাটাকাটি করতে করতে তারা নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েদের সর্বনাশের কিনারায় এনে পুরুষরা কেমন করে সরে যায়, সে দৃশ্য নার্সিং হোমে হরিদাসী অনেকবার দেখেছে। মানুষের দুঃখ, যন্ত্রণা, এমন কি মৃত্যুও তাকে আর তেমন করে বিচলিত করে না। সে ভাবছিল, এবার নাটকীয় কিছু একটা হবে। ঐ মেয়েটি জলে ঝাঁপ দেবে। ঐ জল অগভীর। ওরা ডুববে না। ওরা জল মেখে, বালি মেখে কেমন করে নাকাল হয়ে ফিরে আসবে সে কথা ভাবতে হরিদাসীর হাসি পাচ্ছিল।

সে সব কিছুই হলো না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, অনেক কথা বলে তারা দু'জন ফিরে এসেছিল। নিজেদের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকেছিল। হরিদাসীর এ কথাও মনে আছে, পুরুষটি একটা কেটলী হাতে গরম দুধের খোঁজে বেরিয়েছিল। আর, অনেকক্ষণ বাদে, মেয়েটার কান্না সহ্য করতে না পেরে নিজের স্পিরিট স্টোভ আর দুধের প্যানটা নিয়ে ও তাঁবুতে উঠে গিয়েছিল।

মেয়েটি তাকে সুন্দর মার্জিত ভাষায় ধন্যবাদ দিয়েছিল। পুরুষটি যখন দুধ নিয়ে ফিরে এল, তখন ছোট তিনমাসের শিশুটি দুধ খেয়ে শান্ত হয়েছে।

মেয়েটি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল,

—জান, ওঁর তাঁবু ঐখানেই। উনিও আমাদের মতো লোকজনের ভীড়, ঠেলাঠেলি সহ্য করতে পারেন না। তাই তাঁবু নিয়েছেন। আমি বলেছি, বেবি বেশী কাঁদলে ওঁকে ডাকব। উনি একজন ট্রেইণ্ড্ নার্স।

ছেলেটি নমস্কার করেছিল।

ভদ্রপোশাক পরা মানুষ তাকে 'আপনি' বলে ডাকলে অভিভূত হয়ে যাবার মতো লোক হরিদাসী নয়। এই সব মেয়ে-ই নার্সিং হোমে

তাকে 'আয়া' বলে ডাকে এবং গরম জলের ব্যাগ, খাবার জল, চা, এই সবের জন্য ব্যতিব্যস্ত করে।

সকালবেলা সে মানব চরিত্রের আর একটা দিক দেখেছিল। পাঁচখানা একশো টাকার নোট আর মেয়েটিকে তার কাছে রেখে ওরা পালিয়েছে। ওর তাঁবুতে, ওর বিছানায় ঘুমন্ত শিশুটিকে দেখেই তার সন্দেহ হয়েছিল। সে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে ভেবেছিল, কাল রাতে যে মা, বাচ্চাকে নিয়ে পুরুষটিকে ত্যাগ করে স্বাধীন জীবনের কথা ঘোষণা করছিল, সেই মা-ই রাতারাতি তার মন বদলিয়েছে। একটা শিশুর দুর্বল দুখানা হাতের চেয়ে ঐ পুরুষটির আশ্রয় তার কাছে বেশী নিরাপদ মনে হয়েছে। যাবার সময়ে মা কেঁদেছে কি না, দুর্বল হয়েছে কিনা, সে সব চিন্তাকে হরিদাসী আমল দেয়নি। সে মেয়েটিকে তুলে নিয়েছিল।

॥ ২ ॥

শিউলীকে মানুষ করবার সময়ে হরিদাসী বেশী স্নেহ-মমতা খরচ করেনি।

তাকে সে খাইয়েছে, পরিয়েছে, মানুষ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে দিয়েছে, তাদের দুজনের মধ্যে একটা দূরত্ব আছে।

সত্যি পরিচয়টা শিউলী কোন্‌দিন পাড়া-প্রতিবেশীর কাছেই জানতে পেরেছে।

শিউলীর বয়স দশ বছর হবার পর হরিদাসী নার্সিং হোমের চাকরীটা হারিয়েছিল।

তখন ছেলে মানুষ করবার ঝি হিসেবে সে এবাড়ী-ওবাড়ীতে চাকরী পেয়েছে।

শিউলীকে খুব কড়া নজরে রেখেছে। বলেছে—তোমার সঙ্গে সকলেই ঘনিষ্ঠ হতে চাইবে। ওরা জানে আমার টাকা আছে। ওরা

জানে আমার যা কিছু, সব তুমিই পাবে। কিন্তু তাই বলে তুমি যেন নিজেকে খেলো ক'রো না। যারা নিজেদের দাম বোঝে না, তারা দাম পায় না।

তারা কি পায়?

কর্পোরেশনের ইস্কুলে অল্পদিন পড়া শিউলী সে সব কথা বোঝে না। তার কেমন যেন মনে হয়, ঐ সব ঘর-সংসারে সুখ আছে! ওবাড়ী-এবাড়ীর বৌদের মতো জানালা ধরে স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করার নামই সুখ।

শিউলীর বয়স বাড়ে।

পাড়ার মধ্যে যাদের পয়সা আছে, সেই মোহন মিত্তিরের ছেলে সুবল শিউলীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

একদিন ঘরে ঢুকে হাত চেপে ধরেছিল। বলেছিল—আমাকে বিয়ে করবি। আমার মা হরিদাসীকে বলবে।

শিউলীর কথাগুলো শুনতে খুব ভালো লেগেছিল। কিন্তু হরিদাসী সে কথা কানে নেয়নি।

সে বলেছিল—আমি ওকে সুখে রাখব। সুখের ঘরে দেব।

হরিদাসী যে সুখের কথা ভেবেছিল, সে ঘর-সংসারের সুখ নয়।

সে ভেবেছিল, শিউলীকে মাসীর কাছে নিয়ে যাবে।

মাসীর কাছে বড় বড় মানুষের খোঁজ-খবর আছে। সে সিনেমার দু'একজন সুপ্রতিষ্ঠিত মেয়েকে প্রথম এ লাইনে এনেছিল।

মাসী এখনো সিনেমায় এক্সট্রা মেয়েদের কাজ দেয়।

শিউলীকে সে এমন কোন মানুষের কাছে দেবে, যে শিউলীকে টাকা-পয়সা লিখে দেবে, আর হরিদাসীর ভবিষ্যৎ জীবনটাও অনেক নিশ্চিন্ত হবে।

এই চিন্তার মধ্যে সে কোন পাপ দেখতে পায়নি। কেন না, একদিন এই বৃত্তিটা একটা বিশেষ শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন এই বৃত্তিটা সমাজের সব জায়গায় ছড়িয়েছে।

হরিদাসী জানত, সে নিজে যদি ঐ রকম কালো-কুৎসিত না হতো, সে-ও ঐ বৃত্তিই নিত।

তার মতো হুঁশিয়ার মানুষকে কেউ ঠকাতে পারত না। তাই, যে কথা সে নিজের সম্পর্কে-ও ভেবেছে, সে কথা শিউলীর সম্পর্কে ভাবতে তার কোন অসুবিধে হয়নি।

যাদের চেহারা নেই, তারা রং মেখে গড়ের মাঠে ঘোরে, চৌরংগীতে ঘোরে, ভিক্টোরিয়ার সামনে দাঁড়ায়।

শিউলীর চেহারা আছে। তাই, সে তাদের চেয়ে অনেক নিরাপদ এবং উঁচু জায়গা পাবে, সে বিষয়ে হরিদাসীর সংশয় ছিল না। কিন্তু মাসী তাকে কোন ভাল খবর দিতে পারছিল না।

তাই হরিদাসী শিউলীকে পাড়ার ছেলেদের চোখ থেকে বাঁচাতে চাইছিল।

তাই সে তাকে রায় বাড়ীতে চাকরী করতে নিয়ে গিয়েছিল।

॥ ৩ ॥

রায়দের পরিবারটি এখনও একান্নবর্ত্তী।

এই পরমাশ্চর্য সম্ভব করেছে দুখানা বড় হার্ডওয়্যারের দোকান, বালতির কারখানা, লণ্ড্রী দুখানা আর কো-অপারেটিভ ফার্ম। জমিদারী না-ই বা থাকলো—জাতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ফার্ম করতে বাধা কি?

ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরে এগিয়ে ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে ভেতর দিকে সুবিশাল ফার্ম। বিস্তীর্ণ জমি কাঁটাতার আর ভ্যারেণ্ডার

ঘন বেড়া দিয়ে ঘেরা। আলু থেকে সুরু করে সব রকম তরি-তরকারী আবাদ হয় সেখানে। জমির মতো জমি পড়ে ছিলো—রায়েদের সেজ বাবুর বুঝি নজর পড়েছে। আম, জাম, লিচু আর নারকেল-বাগান বছরের পর বছর পরের হাতে জমা থাকতো। কখনো-সখনো বাড়ীতে আসতো ডালা। এখন সেই বাগানই ভোল বদলে হয়েছে ফার্ম! বাবুদের ছেলেদের শখ হলে বাগানের সংলগ্ন ঝিলে মাছ ধরতে যায়। শীতকালে বনভোজন করে। বারমেসে খোঁজ-খবরদারী করবার জন্যে জুটেছে একজন। সম্পর্কে এদের ভাগ্নে। আত্মীয়তা খুঁজতে গেলে দেখা যায় ডালপালা বা লতা-পাতা নয়, গোড়া জড়িয়েই সম্পর্ক। তবে ঐ পর্যন্তই। অনিল কোনদিনও আত্মীয়ের দাবী করে না। আর রায়বাড়ীও সে কথা জানে। তার কাজটুকু দিয়ে প্রয়োজন এদের। তার বাইরে খুব একটা ভাবে না এরা।

রায়বাড়ীর একতলায় সূর্যের আলো ঢোকে না। উঠোন মাঝে রেখে চকমেলানো তেতলা বাড়ী। চারদিকে ঢাকা দালান। দালানের পরে ঘর। ছাতের মুখে জাল ফেলা আছে। সে জালের ফাঁক দিয়ে রোদ পড়ে উঠোনে ঠিক দুপুরবেলা। সে রোদও চৌকো চৌকো ছক-নকসা কাটা—নিচের তলাটা যেন গারদখানা। আর জালের ফাঁক দিয়ে ছক কাটা রোদটা আসে, যেন জেলখানায় রোদ ঢুকছে।

শিউলী দেখে সারি সারি বড় বড় চকমেলানো আঁধার-ঘর। চৌকি তক্তাপোষ পাতা—তাতে গুটোন বিছানা। দড়িতে জামাকাপড় ঝুলছে। কোন ঘরে ভেজা কাপড় মেলা। বাতাসহীন ঘরে তার স্যাঁৎসেঁতে গন্ধ ঢুকে হাঁপ ধরিয়ে দেয়। ভেতরে দালান। তাতে মিটমিটে বাতি জ্বলছে দিনমানেই। দেয়ালে দাঁড় করানো সার সার পিঁড়ি। পাশাপাশি জলের ঘড়া। আর গোছা করা গেলাস।

বড় বাড়ীর পরিবেশে এসে হরিদাসীর গলা সম্ভ্রমে নিচু হয়। বলে—আজও এ বাড়ীতে তিন কুড়ি পাত পড়ছে এক বেলা। সোজা কথা! এককালে যা দেখেছি।

নিচতলায় আশ্রিত পরিজন, আড়ত, দোকান ও গোলাবাড়ীর মানুষ, চাকর-দাসী আর সেই সব আত্মীয়াদের বাস—যাঁরা সম্পর্কে খুড়ী, জ্যেঠি, পিসী, মাসী। অর্থাৎ সম্পর্ক নেহাৎ দূরের নয়। তবে দাপটের দিন চলে যাওয়াতে বর্তমানে অন্যান্যদের সঙ্গে নিচতলাতেই নির্বাসিত হয়েছেন। দোকান, আড়ত, ব্যবসাপাট ও গোলাবাড়ী সংক্রান্ত অনেকগুলি মানুষ খায়। তাদের ডাল ভাত তরকারীর ঢালাও বন্দোবস্ত করতে অনেক মানুষের প্রয়োজন। আত্মীয়ারা তাই ভাঁড়ার, তরকারী, লুচির ময়দা ও দুধের বন্দোবস্তের ভার হাতে পেয়েছেন।

নিচতলার দেয়াল নোনা ধরা। দেয়াল আর দরজার পাল্লা, রেলিং সবই চূণের দাগ ও তেল-ময়লায় মলিন।

দোতলায় বাড়ীর মেয়েমহল। গিন্নী, মেয়ে, ছেলেপিলে আর তাঁদের ঠাকুরঘর। তোলা-উনোন ও ষ্টোভে শৌখীন কচুরী-চপ ভাজবার ছোট রান্নাঘর, বাসন-কোসন, গালিচা জাজিম, পূজো-দোলের সাজসরঞ্জাম বোঝাই ঘর।

দোতলা একতলার তুলনায় অনেক ফাঁকা, পরিষ্কার—দেখতে ভাল। তিনতলার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে শিউলী কৌতূহলে। চোখে পড়ে বারান্দার সার সার টবে পাতাবাহার। দরজায় রঙীন পর্দ্দা। এ ঘর ও ঘর থেকে রেডিও বাজে।

হরিদাসী বলে—অমন করে দেখিস্‌নি। ওপরে বাবুরা থাকেন।

গিন্নী এখন বড় বৌ। সুবৃহৎ বারকোসে বিকেলের জলখাবারের ঘি ময়দা মেপে দিয়েছেন একতলার খুড়ীমা। দোতলায় বসে বড় বৌ একনজর দেখে সে পরিমাণটা মঞ্জুর করবেন—তবে নিচে নিয়ে যাবে দাসী। হরিদাসী আর শিউলীকে যেন দেখেও দেখেন না বড় বৌ। দাসীকে নানা নির্দেশ দেন। বলেন—বামুন দিদিকে বলবি লুচি যেন খাস্তা হয়। আর তরকারীতে ঝাল দেয় না যেন। ছেলেরা খেতে চায় না মোটে!

তারপর হরিদাসীর দিকে তাকান। সভয়ে চেয়ে থাকে শিউলী। পাতলা পানের পিকে কালো ঠোঁট দুখানা কেমন যেন নিষ্ঠুর! শিউলীকে প্রণাম অবধি করতে দেন না। বলেন—থাক বাছা!

হরিদাসীর দিকে ফিরে বলেন—ঝি চেয়েছি বলে এই আগুনের খাপ্‌রা নিয়ে এলি? তোর কপালে জোটেও তো। হ্যাঁ হরিদাসী? এই ভরা বয়সের মেয়েকে বাপু আমি দোতলায় রাখতে পারব না। দোতলায় তেতলায় বিছানা মাদুর করবে, কাপড় তুলবে গোছাবে, ঘরদোর ঝাড়বে এমন একটা লোক চাইলুম!

তারপর শিউলীর দিকে ভাল করে চেয়ে বলেন—চুল যে পিঠ কোমর ছাপিয়ে পড়ছে। আর আমার বৌ-মেয়েদের এত যে ভাল ভাল তেল মাখাই—

হরিদাসী বলে যায় মুখস্ত বুলির মতো—হ্যাঁ মা, তোমার পায়ে ধরি—তুমি ছাড়া কার কাছে যাব মা? দোতলায় না হোক, একতলায় দাও! বাসন বাটনায় দিও না! এই ক-টা মাস রাখ!

তারপর?

গিন্নী খনখনে গলায় হাসেন। বলেন—তারপর কি বিয়ে দিবি? জামাই আনবি? তুই আছিস ভাল হরিদাসী। চিরকালটা যেন একভাবে গেল।

তারপর বলেন—নিচে বামুন দিদির সঙ্গে থাকুক! নীরু দেশে গেছে। তা' সে ফিরলে তাকে বরং ওপরে নেবো কাজ করতে। আচ্ছা, দরকার হলে মাঝে মাঝে ঠাকুরপুকুর যাবে ত? বামুন দিদির সঙ্গে?

—যা বলবে তুমি।

বড় বৌ এবার বলেন—কি নাম?

—শিউলী।

—শিউলী, তা ভাল! শোনো বাছা—তোমাকে কাজের জন্যে রাখছি না। তোমার কাজই হবে চৌকি দেওয়া। বামুনদিদি

আর পারে না। যা হোক, বুড়ো হয়েছে ত! রাত করে খেতে আসে সব দোকান আড়তের মানুষ। তাদের ভাতের থালা ধরে দেবে। খাওয়া দেখবে। দেখবে, যেন ঝি বামুনে ভাত না চুরি করে। ভাত চাপা দিয়ে না মাছ তরকারী নিয়ে যায়! এই করতে হবে তোকে।

একটু হেসে ফেলে শিউলী। বড় বৌ বলেন—ভাল। হাসি ভাল। হাসি মুখে ঢুকবে আর হাসি মুখ নিয়েই যেন বেরুতে পার। তবে হ্যাঁ, বাবুরা ঢুকবে বেরুবে। তখন সামনে এস না যেন। ভুলেও ওপরে এস না। সে কুসুমের কথা আমার মনে আছে ত! ভুলিনি।

হরিদাসীর সঙ্গে নেমে আসতে আসতে শিউলী বলে—কুসুম কে মা? কার কথা বলছিল গিন্নীমা?

—সে ছিল একজনা। তোর সে কথার দরকার কি?

এবার অন্য জগতে চলে আসে শিউলী। ঝুল-কালিতে আঁধার মস্ত রান্নাঘর। চারটে উনোন। ছুটো বড় বড় শিল। কোনদিনও সে শিল-নোড়া তোলা হয় না। চারপাশের পরিবেশ কি অপরিচ্ছন্ন, মলিন। তারই মাঝে ধবধবে ফর্সা কাপড় পরে যে ফর্সা রোগা মানুষটি মোড়ায় বসে রান্না করে—সে-ই বামুন দিদি। হরিদাসী নিয়ে যায় শিউলিকে তার সামনে। বলে—তোমার হাতধরা একটা লোকের কথা না বলেছিলে? তা, এই নিয়ে এসেছি। দেখে নাও মোক্ষদা।

—বড়মা দেখেছে?

—তিনিই পাঠালেন যে!

—ও।

ব'লে চোখ ছোট করে মোক্ষদা কড়াইয়ে খুন্তি নাড়াচাড়া করে নেয়। তারপর বলে—বলেছিল জোয়ান মেয়ে রাখবে না। তার মতি বুঝি বদলিয়েছে।

শিউলীর দিকে চেয়ে হঠাৎ একটু হেসে ফেলে মোক্ষদা। মনে হয় মানুষটা মন্দ নয়। মোক্ষদা বলে—এই সব যজ্ঞির বাসন দেখে

ভয় পেওনি মা! এখানে তোমার কোন কাজ নেই। তবে রাত জাগতে পারি না। জনে জনে খেতে দেওয়া আর বসে থাকা—এখন আর পারি না। সেইজন্যে বলেছিলুম বড়মাকে। তা ভালই হলো। অমনি পরিষ্কার হয়ে কাজ ক'রো। পরিষ্কার মানুষ আমি বড় পছন্দ করি।

কাজে লেগে যায় শিউলী। মোক্ষদা বলে—

—শিউলী, ভাঁড়ার থেকে কোটা তরকারীর বারকোশটা নিয়ে আয়।

—শিউলি বাটনার থালা আন।

—শিউলী, এই থালাটা ধরে নিয়ে যা।

এমনি সব ফরমাস। কোমরে আঁচল জড়িয়ে শিউলী ছুটে ছুটে কাজ করে। বেলা এগারোটার মধ্যে বাবুদের রান্না দোতলায় চলে যায়। দোতলায় এদের পিসীমা তোলা উনোনে গরম করে সকলকে বেড়ে বেড়ে খেতে দেন। মস্ত জালের আলমারীতে সব তুলে দিয়ে আসে মোক্ষদা আর শিউলী।

বেলা একটা থেকে খেতে আসে বাইরের লোকেরা। আড়তের লোক—দোকানের কর্মচারীরা। ভাত, ডাল, আর তরকারী। একই রান্না, একই খাওয়া দু-টি বেলা। কেমন করে যে তারা অমন তৃপ্তি করে খায়, ভেবে পায় না শিউলী। আর দুটি ভাত বা আর একটু তরকারীর জন্যে তারা কত আশা ক'রে হাত গুটিয়ে থাকে—দেখে বড় মায়া হয়। ইচ্ছে থাকলেও রোজ দিতে পারে না শিউলী। মোক্ষদা বলে—কে দেখবে, ওপরে লাগাবে—কথা হবে।

—তা ব'লে মানুষগুলো পেট ভরে খাবে না?

—সে বাবুরা বুঝবে। তোর আমার কি? এরা এই রকমই। দেশ থেকে চাল আসছে, বাগান থেকে সব্জী আসছে—ভাবনা তো নেই। তবু এই রকম মার-কাট্ করে এরা সকল বিষয়ে।

শিউলী দেখে সকলের খাওয়া হয়ে গেলে—এক থালা ভাত রান্না-ঘরের দরজায় বেড়ে রেখে লোহার একটা ভারী ঢাকা চাপা দিয়ে চলে যায় মোক্ষদা। দিনেও, রাতেও। এমন একজন কেউ আছে, যে দিনে তিনটে বেজে গেলে খায়—রাত বারোটায় খেতে আসে! কে সে, শিউলী কোনদিনও দেখতে পায় না।

তার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন গিন্নী। বলেছিলেন—হ্যাঁ গো হরিদাসীর মেয়ে। তুমি বসে খাবে, না ভাত নিয়ে যাবে?

রাস্তা দিয়ে ভাত নিয়ে যাবে কি? লজ্জায় শিউলী মাথা নেড়েছিল। তার নিজের খাওয়া হলে ডেকে নিয়ে যান খুড়ীমা। পান সাজতে বসিয়ে দেন। শিউলীর কাজের হাত যে মিষ্টি, একথা সবাই বলে। ওপর থেকে এমন ফরমাস-ও আসে—

—হরিদাসীর মেয়েকে ডাক, পান সেজে দিয়ে যাক!

—শিউলীকে বল, এই কাপড় ক'খানা কুঁচিয়ে দিক।

—ওকে নিয়ে যা চা-এর ঘরে। মাঝে মাঝে চা-টা করুক। বেশ চা করে।

দুপুর গড়িয়ে, উঠোনের সে ছক কাটা আলো মিলিয়ে আঁধার হয়। বিকেল নামে। দালানে গলিতে ঘরে কম পাওয়ারের মিট্‌মিটে বাতি জ্বলে। শিউলী আবার চলে যায় রান্নাঘরে।

শরীর ঢেলে ঘুম নামে। কতদিন বা দেয়ালে হেলান দিয়েই ঘুমে ঢুলে পড়ে শিউলী। হরিদাসী এসে হাত ধরে তুলে নিয়ে যায়। যাবার কালে দেখে যায়—ঐ যে একজনের ভাত বাড়লো মোক্ষদা, চাপা দিয়ে রাখলো।

কি রকম সে মানুষটা? খেতে যার সময় হয় না? সে ঘুমোয় কতক্ষণ?

একদিন দেখলো তাকে। মোক্ষদা বলছে—আজ যে অনিল বাবু রাত দশটায় এলে? কোন্‌দিকে সূয্যি উঠেছিল? নিত্যি বাড়া ভাত খেতে ভাল লাগে? ধন্যি মানুষ তুমি!

জল ছিটিয়ে জায়গা করে দিয়ে শিউলী রান্নাঘরের দোরের আড়ালে দাঁড়ায়। উঁকি দিয়ে দেখে। নিজেকে প্রায় ঢেকে রাখে। শিউলীর ফর্সা সুন্দর হাতখানা কালো দরজাটার ওপর দেখা যায় শুধু। চুরি করে দেখে।

বছর পঁচিশের একটি মানুষ। শামলা রঙ, নীল শার্ট গায়ে, ধুতি পাক্‌সাট্‌ মেরে পরা। শিউলী যে তাকে অমন করে দেখছে, সে দিকে মানুষটার খেয়াল নেই। এই রাতে বুঝি স্নান করেছে। ঘাড় দিয়ে, চুল দিয়ে জল চিক্‌চিক্‌ করছে। শিউলীর মনে হয়, না আঁচড়ানো চুলগুলি বেশ। কপালের ওপর ঐ যে এসে পড়েছে, বেশ দেখাচ্ছে। ঠোঁটের ভঙ্গীটাও কেমন সুকুমার!

ভাতে হাত দিয়ে ডাল ঢেলে নেয় সে। তারপর খুব তাড়াতাড়ি করে খায়। ডালটুকু ফুরিয়ে গেলে চেয়ে থাকে ঘাড় ফিরিয়ে। শিউলী দেখে অতগুলো ভাত। কেমন করে শুকনো শুকনো খাবে? তরকারীই বা এতটুকু? মোক্ষদা ঘরে নেই। সে কি করে? আরো খানিকটা ডাল এনে ঢেলে দেয় সে পাতে। চোখ তুলে চায় অনিল। অবাক হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি ঘরে চলে আসে শিউলী। মুখখানা তার অকারণেই গরম হয়ে উঠেছে।

মোক্ষদা কিন্তু খুশী হয়। বকে না। বলে—বেশ করেছিস্! বারো মাস তো যেমন তেমন খায়।

মনটা বোধ হয় ভাল আছে আজ। নইলে অন্যদিন মোক্ষদা উদ্বৃত্ত ভাত তরকারী গামলায় বেড়ে নিয়ে যায় ঘরে। তার আর বামুনের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। আজ তবু কিছু বলে না মোক্ষদা। বরঞ্চ বলে—এদের চোখে চামড়া নেই। তবু অনিল তো পর নয়। ভাগ্নে হয় বুঝি। ওপর থেকে মাছ, ডাল, তরকারী দিতে পারে না দু'একদিন? ওর কি খেতে নেই? তা সে আক্কেল এদের নেই।

শিউলী যাবার কালে দেখে, মানুষটা ঐ কোণের ঘরে গেল। কোণের ঘরের পাশ দিয়ে তারও ঘরে যাবার গলি। টিপতালা খোলে

শেকলে, দিনমানে বন্ধ থাকে ঘর। আজ যাবার সময় দেখে, দড়িতে জামা-কাপড় ঝুলছে। ময়লা তক্তপোষে ময়লা বিছানায় গড়িয়ে পড়েছে মানুষটা। ঘুমিয়েই পড়েছে বুঝি।

শিউলী ঘরে ফেরে যখন, তখন অনেক রাত হয়ে যায়। সব নিশ্চুপ, নিঝ্ঝুম। সব ঘুমোচ্ছে। সারাদিনে যে পথ-ঘাট, টিউবওয়েল, দোকান ঘর, বস্তি—সব ধূলো মাখা, বিশ্রী—রাত্তির বেলা তাই এমন সুন্দর লাগে। শিরীষ গাছটা নড়ে না। গাছের গোড়ায় শুয়ে তিন-চারটে কুকুর ঘুমোয়। মানুষের চলাফেরা কম। সেই সুবল ছেলেটা বয়সের গরমে বুঝি ঘুমোতে চায় না। রাত্তির বেলা তাকেও দেখা যায় ট্রাইসোকোটো হাতে মাথা ঝুঁকিয়ে ফুটপাথে খাটিয়া পেতে বসে আছে। যেন ছবিতে আঁকা ঘুমের রাজত্ব। শিউলীর মনে হয়, রাতটা একরাশ আলো-আঁধারি আর ঘুম এনে ঢেলে দিয়েছে এই সব কিছুর ওপর। এমন অজস্র হাতে ঢেলে দিয়েছে যে, সব ভরে ভরে রয়েছে।

সে বুঝতে পারে না যে, এত সৌন্দর্য্য ধরা পড়ছে, সে শুধু তার আঠারো বছরের চোখে। এই বয়স, আর এই মনে যে সব সুন্দর লাগে, তা সে জানে না।

নিজে পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়তে না পড়তে কে যেন একরাশ ঘুম ঢেলে দেয় তার অঙ্গ ভরে। ঘুমিয়ে যায় শিউলী।

॥ ৪ ॥

অনিলের কাজে একটু কম পড়েছে। একটু তাড়াতাড়ি ফেরে অনিল আজকাল। তারপর এই ভরা বর্ষার মধ্যে এক ঝাঁক শীতের তরকারী উঠবে। বীন, গাজর, পালং, বিলিতী বেগুন। এমনি সময় চড়া দামে বিকিয়ে যাবে। সৌখীন বাঁধা কপি, মটরশুটিও দেখা

যাবে। তখন আবার সময় পাবে না অনিল। দিন রাত কেটে যাবে বাগানে।

আজকাল যেন মনে হয়, অনিলের জন্যেও ঐ বাড়ীতে ভাবনা করবার কেউ আছে। যত রাত হোক, ভাতটা মাঝে মধ্যে গরম থাকে। থালাটিও পরিষ্কার। আর সামান্য ভাজাভুজি বা সৌখীন তরকারী যা ওজন মেপে বের করে দেন বড় গিন্নী আর রান্না হতে না হতে যা থালা সাজিয়ে ওপরে নিয়ে চলে যায় শিউলী—তারও একটু-আধটু দেখা গেল অনিলের থালার পাশে। কে এই যত্নটুকু করে? অনিল যে আত্মভোলা উদাসীন, তারও নজরে পড়েছে। তবে তাকে আর দেখেনি। মুখখানা দেখতে সাধ যায়। এ বাড়ীতে এমন কোন্ মানুষ এলো, যে অনিলের জন্যে এমন একটু ভাবে? রোজই অনিল মনে ভাবে জিজ্ঞাসা করবে।

শিউলীকে পেয়ে মোক্ষদারও কম সুখ হয়নি। দশটা না বাজতে সে পাট চুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। শিউলী এক এক করে বাইরের মানুষদের খেতে দেয়। অনিলের পাতের পাশে একটা কাঁচা লঙ্কা, একটু আচার, বা তার হাতে শখ করে দেওয়া ওপর থেকে ভাল তরকারী ধরে সাজিয়ে দিতে দিতে রোজই তার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করে। মনে হয়, যদি কেউ দেখে? কে কি বলবে? সকলে চলে যায়! একা অনিলের জন্যে সে বসে থাকে। আঁধার নিচতলাটাকে কেমন ভয় ভয় করে। বাবুরা এক একজন ফেরেন—ওপরে চলে যান। চাকর-বাকরদের খেতে দেবার পাট—সে বড় বিশ্রী। মোক্ষদাই সে সব ঝামেলা চুকিয়ে যায়। এদিকে আর কেউ আসে না। নিচের মহলে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে একজন বুঝি এদের পিসী। স্বামী আর ছেলে, দু-জনে মরতে এখানে এসেছেন মহিলা। রাত হলে এখনো বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদেন এক একদিন। সে কান্নাটা কেমন যেন নিচ ছেড়ে ওপরে ওঠে না। নিচেই ঘুরে ঘুরে গুমরে গুমরে মরে। শুনে শিউলীর একলা একলা গা ছম্ছম্ করে। বাতির

আলো এমন মিটমিটে যে, আলো না করে আঁধার করেছে বেশী। পুরানো বাড়ী থেকে ভ্যাপসা গন্ধ ওঠে। এরই মধ্যে ওপরতলা থেকে নানা রকম সাড়া পাওয়া যায়। মেজবাবুকে মেজবৌ গালাগালি করে চলে—মদ খেয়ে ফেরবার জন্যে, মাতাল হবার জন্যে। এদিকে ছোট বাবুর ঘর। শিউলী শুনেছে ছোট বাবুর বিয়ে হবে। মেয়ে দেখা চলছে। ঝি-চাকররা হেসে হেসে বলে—এবার নয়ন দিদির শাস্তি হবে। মজা দেখবি'খন।

নয়ন বড় গিন্নীর কোন্ সম্পর্কের এক বিধবা বোন পাড় দেওয়া কাপড় পরে, লেসের জামা পরে, পান খায়, হার দুল পরে। একান্নবর্তী হলে কি হয়, প্রত্যেকে প্রত্যেককে সন্দেহ করে। এই একান্নবর্তীতার মূলে আর যাই থাক, বিশ্বাস নেই। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। বড় বাবু নির্বিরোধী লোক। বড় বাজারের আড়তেই থাকেন বেশী সময়। নিঃসন্তান বড়বৌ নিজেকে কমজোরী মনে করতেন। তাই বোনকে আনিয়ে নিয়েছিলেন। নয়নের সঙ্গে ছোট বাবুর ঘনিষ্ঠতার কথাটা নেহাৎই গল্প কথা নয়। একটি বৃহৎ প্রাচীনপন্থী পরিবারে—যদি খাবার পরবার ভাবনা না থাকে, এমন সব কলঙ্ক-কুৎসা ঘটবেই। এ সব যে এমনিধারা পরিবারের অপরিহার্য অঙ্গ তা ত' শিউলী জানে না। তার খুব আশ্চর্য মনে হয়। খুব আকর্ষণ বোধ হয়। আবার ভয় ভয়ও করে। মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করে—আচ্ছা নয়নের মনে দুঃখ হচ্ছে তো? এই যে ছোট বাবু বিয়ে করতে চলেছে? আবার বিয়ে না করেই বা কি করবে। এদের এমন মস্ত ব্যাপার। ছোট বাবুর নাকি আলাদা করে ব্যবসা আছে। এদের কত ব্যবসা! আচ্ছা নয়নের মনে তা হ'লে খুব কষ্ট?

কিন্তু নয়নকে সে দেখেছে। ওপরতলার হুকুম ফরমাস বয়ে মাঝে মধ্যে নয়নই আসে নিচে। নয়নের কালো চুলে ঢাল খোঁপা। পেশী বলিষ্ঠ শক্ত শক্ত হাত পা, পাতলা ঠোঁট আর চোখে বিদ্রূপের

ছুরি খেলে বেড়ায়। দেখলেই ভয় ভয় করে শিউলীর। একে সহানুভূতি দেখানোর কথা মনেও আসে না।

আবার এক একদিন, দক্ষিণের ছাদ থেকে নয়ন আর ছোটবাবুর খিলখিল হাসি, তাও শুনেছে সে।

সব শব্দ থেমে যায়, তবু মানুষটা আসে না কেন? এত কাজ তার?

তারও পরে আসে অনিল। এই নিচের তলায় তারা দুজন জেগে আছে শুধু। তবু কোন কথা হয় না।

একদিন রাত এগারটা বাজে। শিউলী দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে।

অনিল এসে কোন সাড়া পায় না। রান্নাঘরে যায়—নিজেই থালাটা নিয়ে আসবে। দেখে, ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। বড় সুন্দর মুখখানি ত'? গা ধুয়ে ফর্সা একখানা ছাপা ডুরে শাড়ী পরেছিলো শিউলী। এখন খোঁপা একটু ভেঙে নেমে এসেছে। শাড়ীর পাড় আর জামার গলার মাঝে ফর্সা গাটুকু ঘামে চিক্‌চিক্ করছে। একখানা হাত মাথার পেছনে। আর একখানা হাত মাটিতে বিছিয়ে গেছে।

অনিল চুপ দেখে। এমন সুশ্রী একটা ছোট মেয়ে তারই জন্যে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে তার খারাপ লাগে। অনিল ভাবে—ডেকে কাজ নেই। তারপর ভাবে, সে ত চলে যাবে নিজের ঘরে। ঐ মেয়েটা এমনি করে ঘুমোবে?

শেকল টেনে শব্দ করে অনিল। শিউলী জাগে না। আবার শেকল টানে। শিউলী কপালটা কুঁচকোয়। অনিল এবার ডাকে—শুনছ! শোন! ওঠো না। মাটিতে পড়ে ঘুমোচ্ছ কেন?

ধড়মড়িয়ে জেগে ওঠে শিউলী। গায়ে কাপড় টেনে দাঁড়িয়ে ওঠে।

আজ যখন ভাত ধরে নিয়ে আসে শিউলী, তখন অনিল বলে—শোন, রোজ রোজ এমন করে রাত জাগ কেন তুমি? আমার জন্যে কেউ ত' বসে থাকে না? তুমি জান না বুঝি? নতুন কি না!

একটু মাটির দিকে চেয়ে, বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি ঘষে শিউলী লজ্জাটা সামলায়। আস্তে আস্তে বলে—তাতে কি হয়েছে? আমার কষ্ট হয় না।

তার জন্যে রাত জেগে থাকতে কষ্ট হয় না? এমন কথা অনিল কোনদিনও কারু কাছে শোনেনি। নীরবেই খায়। তারপর বলে—ব'সো ওখানে! ব'সো না! আচ্ছা নাম কি তোমার, বল তো?

একটু বোকার মতো হেসে অনিল বলে—ক-দিন ধরেই ভাবছি শুধোব। তা অবসর হয় না।

শিউলী অল্প অল্প ঘামে। বলে—এ বাড়ীতে সবাই শিউলী বলে আমাকে।

অনিল বলে—শিউলী? বেশ নাম। তা শিউলী—এখানে কেমন করে এলে?

—কলকাতায় নিয়ে এসেছে যে জন, সেই দিয়ে গেছে।

—সে তোমার মা?

শিউলী হেসে মাথা নাড়ে। বলে—মা বলে ডাকি।

কথা কইতে কইতে এসে পড়ে হরিদাসী। শিউলী থালা তুলে রান্নাঘরে রাখে। রান্নাঘরের বাতি নেবায়। ঘরে তালা দেয়। চাবিটা নিয়ে টুপ করে খুড়ীমার ঘরে ফেলে দেয়। যাবার সময়ে চেয়ে দেখে অনিলও জানালা দিয়ে দেখছে। দুজনেই একটু হাসে। শিউলীর আবার মনে হয়—অনিলের হাসিটা ভারী মিষ্টি।

এমনি হয় আরো। এতদিন অনিল ফিরবার পথে দু' দণ্ড দেরী করে ফিরতো। এখন যেন কোথায় তাগিদ থাকে। আবার মুখে না বলে মনে মনে যেন এটা বুঝে নিয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি করে আসলেও হবে না। দশ জনের ভিড়—আর ছল খুঁজবার চোখ প্রত্যেকেরই। যদি বা কাজ হয়ে যায় সাড়ে নটায়, ফিরতে ফিরতে অনিলের ঠিক সাড়ে দশটা বাজে। খেতে বসে অনিল উৎসুক চোখে চায়। শিউলীও এখন একটু সহজ হয়েছে। বাগানের কথা শুনতে

তার খুব ভাল লাগে। বলে—বেশ গ্রামের মতন, তাই না? আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করে।

—একদিন গেলেই হয়।

—কে নিয়ে যাবে?

—তাই ত! তা, এখন না হোক, শীতকালে ঠিক এরা যাবে। তখন তুমিও যেও!

—যাব! তা সেখানে দিনমান এই পরিশ্রম, শরীর কি ভাল থাকে?

—তা কি হবে শিউলী? কাজ, তা সে যে কাজই হোক, করতে তো হবেই।

—এরা কে হয়?

—সম্পর্ক টানলে মামা!

মনের কথা বলে ফেলে অনিল। বলে—খাই থাকি—পঞ্চাশটা করে টাকা দেয়। পূজোয়, হালখাতায় নতুন কাপড়ও দেয়। একলা মানুষ, চলে যায়। তবে এই কাজ করবো, তা কি ভেবেছিলাম? ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম—মামা বলেছিলো পড়াবে—তা সব কি আর হয়? কোমরের জোর না থাকলে কিচ্ছু হয় না। আর সাত কূলে কেউ নেই যার·········

—আর কেউ নেই?

—কেউ না। ধোয়া মোছা। একলা মানুষের এর চেয়ে কি হবে বল?

—বড় কষ্ট তো তোমার?

—কেন? একলা মানুষ, চলে যাচ্ছে বেশ।

কিছুক্ষণ ভেবে শিউলী বলে—আমারও কেউ নেই।

—হরিদাসী তোমায় ভালবাসে?

—নিজের ত' নয়। নিজের কেউ না থাকলে ভাল লাগে?

ছোট্ট একটু নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে শিউলী। তখন অনিলও আর কথা খুঁজে পায় না।

একদিন অনিলের চোখে পড়ে, শিউলীর হাত খালি। কাচের চুড়ি দু'-চার গাছার একখানাও নেই। বলে—কি হলো শিউলী? হাত খালি কেন?

—হলেই বা।

—কেন হলো?

—আদা বাটতে গিয়ে ভেঙে গেল।

—হাত কেটেছে?

—সামান্য।

—কই দেখি?

বলে কিছু না ভেবেই শিউলীর হাতখানা তুলে ধরে অনিল। ফর্সা হাতে লাল দাগ! সামান্য কেটেছে। কিন্তু হাতে হাতখানি ধরতে শিউলী এমন লাল হয়ে যায়, এমন থরথর করে কেঁপে ওঠে তার হাত যে, অনিলও লজ্জা পেয়ে যায়। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয় হাত। হাত ছেড়ে দেয়, আর দুজনে দুজনের দিকে চায়।

সামান্য কয়টা মুহূর্ত। বুঝি বা তাও নয়। তাতেই দুজনে দুজনকে দেখতে পায়। পরিবেশের দৈন্য, কুশ্রীতা আর গ্লানি সবই ঝরে খসে পড়ে যায়। এক পলের জন্যেও শিউলীকে অনিলের চোখে পরম সুন্দর দেখায়।

সেদিন দুজনেই কেমন যেন হয়ে যায়। অনিলের আর রোজকার মতো শুতে না শুতেই ঘুম নামে না চোখে। তার মলিন ঘর, তার সমস্ত জীবনটার দৈন্য অন্ততঃ আজকে তাকে পীড়িত করে না। কি রকম যেন লাগে অনিলের।

আর ঘরে ফিরে সেদিন শিউলীরও ঘুম আসতে চায় না। উপুড় হয়ে শুয়ে বুকের কাছে কেমন ব্যথার মতো লাগে! মনটা যেন কেমন হয়ে থাকে।

হু'-চারদিন যায়। এমনি করে-ই। হুজনে তেমন কথা হয় না। শিউলী কেমন যেন আড়াল রেখে চলে। ভীরু মন। এতটুকু সহজ হলেই কুণ্ঠা এসে পায়ে জড়ায়। আর হাজারটা অনুশাসনের ভয়। একান্ত স্বাভাবিক আচরণকেও মনে হয় অপরাধ।

রাতে আর হরিদাসীর জন্যে অপেক্ষা করে না সে। কাজ সেরে চলে যায় বাড়ী। এক দিন, হু'দিন, তিন দিন। সেদিন রাতে ঘরে ফিরবার সময় অনিল ডাকে—শোন: শিউলী, শোন। একটু দাঁড়াও।

দাঁড়ায় সে মাথা নিচু করে। অনিল এসে দাঁড়ায় দেউড়ির পাশে। মস্ত গেটখানার ছায়া হু'জনের ওপরে পড়ে। পকেট থেকে কি যেন বের করে অনিল। শিউলীর হাতে দেয়। একটু অপ্রস্তুত হেসে বলে—সেদিন দেখলাম হাত খালি ক'রে রয়েছ! পরশুদিন বেহালার বাজার থেকে···তা হু'দিন দেখাই নেই তোমার! প'রো, কেমন?

নিত কি নিত না শিউলী···অনিল তার হাতে গুঁজে দিল মোড়কটি। তারপরই গেট খুলে তাড়াতাড়ি চলে গেল শিউলী।

বুকের ভেতর ঢেঁকিতে পাড় পড়ছে। ঘরে পৌঁছিয়ে তাড়াতাড়ি দোর বন্ধ করল শিউলী। কি ভাগ্য যে হরিদাসী নেই ঘরে।

কালো আর সোনালীতে কাজ করা কাচেরই কাঁকণ, বেশ জিনিষটি। এক গাছাতেই হাতের শোভা। মোটাও আছে, এক টাকা, পাঁচ সিকে দাম হবে। কাঁকণ-জোড়া নিয়ে চেয়ে রইল শিউলী।

কেন এমন হয়? তাকে যে ছোট সুখ, ছোট আশার স্বপ্ন দেখতে মানা করেছে হরিদাসী। তবু এক গাছা কাঁচের কাঁকণ, তাই হাতে নিয়েই কেন সুখ হয় মনে? ঈষৎ ভুরু কুঁচকে ভাবে সে।

তারপর ভাবে অনিলকে মানা করে দেবে—এমন দেওয়া-নেওয়া ভাল নয়।

আরো ভাবে, এখন থাক। কালকে বিকেল বেলা হাতে সাবান দিয়ে ফেনা করে পরবে কাঁকণ-জোড়া।

তার হাতে কাঁকণ দেখতে বড় ভাল লাগে অনিলের। বলে—ভারী মানিয়েছে, জান শিউলী ?

সে হাসে। অনিল একটু আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকে। বলে, তোমাকে কেমন যেন এই ছোট কাজে মানায় না। এদেরও যেমন বিবেচনা ! অন্য কাজে দিতে পারত না ?

খেয়ে দেয়ে উঠে দাঁড়ায় অনিল। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কথা কয়। অনিল বলে—পরশু থেকে হয়তো বাড়ীতে আসব না আমরা দিন ছয়-সাত।

—কেন ?

—বাগানে কাজ পড়বে যে ! এখান থেকেই বামুন-চাকর যাবে। গেলে পরে দেখতে কি কাণ্ডটা হয়।

—কি হবে ?

—তরকারী সব তুলতে, ওজন করতে, পাইকারকে দিতে—বেশ ঝামেলা। আর পুরো ঝক্কিটা আমার ওপর দিয়ে যায় কিনা ! আমারই হয় দুর্দশা।

—এত ঝামেলা একজনের ঘাড়ে ?

—বাঃ, আমি ওদের নিজের মানুষ নয় ? আমি আছি বলেই না ওরা নিশ্চিন্ত আছে ? ওদের সাধ্য কি ? আর কি জান, ওরা এত কষ্ট করতেও পারতো না। সে কি আমার মতো সবাই ? জলে জলে ভিজছি, রোদে পুড়ছি—দিব্যি আছি। এখন রাতে চৌকি রাখতে হয়। একসঙ্গে দুশো ডাব গাছ থেকে ডাব পাড়াব—চালান দেব ! ওঃ, সে দেখবার ব্যাপার।

আপন মনে কথা বলে চলে অনিল। ঘাড় কাত করে শোনে শিউলী। হঠাৎ অনিল বলে—চুড়ি দিলাম ব'লে রাগ করনি ত ?

—না। রাগ করতে পারি কখনো ? তবে……

—কি ?

—দেবার দরকার কি ?

—যার দরকার সেই জানে।

এমনি করে কোন ভূমিকা ছাড়াই অনিল শিউলীকে ভালবেসেছে।

শিউলী বলেছে—তুমি আমায় বিয়ে করবে?

অনিল বলেছে—নিশ্চয়! তোমায় আমি বিয়ে করব। তোমার আর আমার সংসার হবে শিউলী। সে জীবনে অনেক সম্মান।

বলেছে যখন, তখন হয়তো কথাটাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। তারপরে তারও মনে হয়েছে, এ জীবনটার চেয়ে সে জীবনটা ভালই হবে। সে জানে, এ বাড়ীতে তার অবস্থাটা চাকরবাকরেরই সমতুল্য।

সে বলেছে—আমরা পালিয়ে যাব। পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করব। কিন্তু, কথা দেবার পর, সে রাতে তার সাহসে কুলোয়নি।

শিউলী যতক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষা করেছে, এই ভীরু নির্বিরোধী মানুষটি নিজের ঘর থেকে বারান্দা আর বারান্দা থেকে ঘরে পায়চারি করে রাত কাটিয়েছে।

তার বন্ধু তাকে আমল দেয়নি। বলেছে—বিয়ে করে খাওয়াবি কি? তা ছাড়া, পুলিশে যদি হাঙ্গামা করে তুই সামলাতে পারবি?

অথচ শিউলী তার কথাকে বিশ্বাস করেছে।

সকালবেলা, ভীরু চোরের মতো অনিল অপেক্ষা করেছে। কি জানি কি খবর আসবে! শিউলী হয়তো ফিরে যায়নি।

হয়তো পুকুরে ডুবে মরেছে।

সে সব চিন্তা তাকে বৃথাই পীড়িত করেছে।

পুরুষের প্রেমের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস হারিয়ে শিউলী ফিরে গেছে নিজের ঘরে।

অনিলের সঙ্গে শিউলীর আর দেখা হয়নি।

॥ ৫ ॥

বান নয়, জীবনের ঢেউই আবার ভাসিয়ে নিল শিউলীকে।

মাসীর বাড়ীতে ঢুকবার পথ ছিল। বেরুবার পথ ছিল না। হরিদাসী তাকে অনেক বোঝাতে বোঝাতে এনেছিল।

শিউলী কাঁদেনি। প্রতিবাদ করেনি। সে জেনেছিল হরিদাসী এখন টাকা পেয়েছে এবং পরেও পাবে। তাকে খাওয়াবার, পরাবার, মানুষ করবার দামটা যে হরিদাসী এমনি করেই তুলে নেবে, তা সে বুঝে নিয়েছিল।

তার মধ্যে কোন দুর্বলতা দেখা যায়নি। হরিদাসী একটু অবাক হয়েছিল। কেন না, একসঙ্গে এতদিন বসবাস করলে তার ওপর যে মায়াটা পড়া স্বাভাবিক, সে মায়াটা শিউলীর মধ্যে দেখা গেল না।

এটাকে সে অকৃতজ্ঞতা বলতে পারছিল না। কেন না, কেনা-বেচার জিনিষটার বিক্রেতা বা ক্রেতার সম্পর্কে কোন অনুভূতি হতে পারে না।

তবু তার রাগ হচ্ছিল। কেন না, এখন তার বয়স হয়েছে। শরীরের ও মনের গ্রন্থিগুলো শিথিল হয়েছে। এই সময়ে ডুকরে কান্না, মনের সব অনুভূতির সস্তা প্রকাশ, এ সব ভাল লাগে।

সে বলেছিল—শিউলী কি এর পরে আমাকে চিনতে পারবি ?

শিউলী জবাব দেয়নি।

একদিকে অনিলের আচরণে সে যেমন আঘাত পেয়েছে, অন্যদিকে সিনেমায় নামবার ইচ্ছাটা তাকে প্রলোভন দেখিয়েছে।

একমাত্র ঐ লাইনে গেলে তবেই সে অনেক পয়সা করতে পারবে। এবং তার মনে হচ্ছিল, কোন মতে অনেক পয়সা করতে পারলে তবেই সে অনিলকে, অনিলের মতো পুরুষদের জব্দ করতে

পারবে। অনিল যে তাকে ঠকিয়েছে, তার প্রেমকে খেলো করেছে, এই জ্বালাটা তার মন থেকে যাচ্ছিল না।

তবু পাড়াটা ছেড়ে আসবার আগে তার মন কেমন করছিল। তার ইচ্ছে করছিল আর একবার অনিলের সঙ্গে দেখা করে।

সে কথা সে হরিদাসীকে বলতে পারেনি। শিউলী জেনেছিল, সে একটা অশুচি জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। তবু, তার মনে হচ্ছিল, এই স্ত্রীলোকটির সংসর্গে থেকে সে আগে থেকেই অশুচি হয়েছে। অশুদ্ধ হয়েছে।

তার মধ্যে এই ভাবটা হরিদাসী লক্ষ্য করতে পেরেছিল। শিউলীকে তার কেমন যেন নিজের চেয়ে উঁচু স্তরের মানুষ মনে হচ্ছিল। সে শিউলীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। দেখে নিশ্বাস ফেলছিল। শিউলীর বাপ মা তাকে এমন কিছু দিয়েছে, যা হরিদাসীর এতদিনের সংসর্গ বা রায়বাড়ীর কাজ, কোন কিছুতেই মলিন করতে পারেনি। দেখে তার এই মেয়েটির প্রতি অহেতুক রাগ হয়েছিল।

সে সম্পূর্ণ বিনা কারণে, আক্রোশবশতঃই শিউলীকে তার জন্মের আসল বৃত্তান্তটা বলেছিল।

শিউলী সবটা শুনে বলেছিল—তুমি আচ্ছা বোকা। টাকা ক'টা নিয়ে আমাকে ফেলে এলেই পারতে। বুদ্ধি থাকলে তাই করতে।

হরিদাসী বলেছিল—একটা পশু-পাখীর ওপরেও মানুষের মমতা হয়। তুই আমাকে এমন কথা বলতে পারলি ?

সে কেঁদেছিল।

শিউলী সরে গিয়েছিল। সরে গিয়ে নিজে ট্রাঙ্কের ওপর চুপ করে বসেছিল।

এতদিনে নিজের ভদ্র সুন্দর চেহারাটার কারণ জানতে পেরে সে অভিভূত হয়নি। কেন না যারা তাকে ফেলে গিয়েছিল, আর যে হরিদাসী তাকে আজ অন্য জীবনে পার করে দিচ্ছে, তাদের কারো জন্যেই তার মনে এতটুকু সহানুভূতি হয়নি।

সে নিজের জন্যে দুঃখ করে করে, ভেবে ভেবে, সবটুকু সহানুভূতি নিঃশেষ করে ফেলেছিল।

মাসীর বাড়ীতে সে আরো কয়টি মেয়েকে আসা-যাওয়া করতে দেখেছিল।

সেই সব কুশ্রী, নিঃশেষ-যৌবন অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গেও সে আলাপ করবার বা ঘনিষ্ঠ হবার মতো কোন আগ্রহ খুঁজে পায়নি।

সে দুজন পুরুষমানুষকে বিশেষ করে লক্ষ্য করেছিল।

অনঙ্গবাবু। রোগা, পাতলা, একহারা শরীরের প্রৌঢ় মানুষ—যে ভাল জামা-কাপড় পরে আসে—যে মাসীর কাছে এমন কোন কৃতজ্ঞতার সূত্রে বাঁধা যে, তার কথায় বার্তায় মাসীর প্রতি একটা দাসত্বের ভাব ফুটে ওঠে। মাসী এই মানুষটিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, কিন্তু তাকে ছাড়া তার চলে না।

রাজীব। মাসীর ছেলে। সে কিছুই করে না। মাসী বলে—বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে জুয়া খেলা ছাড়া তার অন্য কোন দোষ নেই।

রাজীবের বয়স সাতাশ-আটাশ হবে। কিন্তু, এক বাড়ীতে শিউলীর সঙ্গে বাস করেও শিউলীর সম্পর্কে তার বিশেষ কোন আগ্রহ নেই।

রাজীবকে বুঝতে শিউলীর সময় লেগেছিল। রাজীব বলেছিল—জান, আমি, আমার মা, অনঙ্গবাবু, সকলে একটা মনের অসুখে ভুগছি। জীবনটাই একটা অসুস্থতা। অনঙ্গবাবু মা'র জন্যে জীবন দিতে পারে। মা'রও ওকে ছাড়া চলে না। তবু ওরা বিয়ে করবে না। আমার হাসি পায়।

সে শিউলীকে আশ্চর্য সব ফরমাস করতো। কোন পুরুষ মানুষ যে এত সহজে কোন মেয়েকে মাথা টিপে দিতে বলতে পারে বা পাখা করতে বলতে পারে, তা শিউলী জানত না।

রাজীব তাকে বলতো—আমিই কি কম অসুস্থতায় ভুগছি? কোন মেয়েকে দেখলে আমার ভাল লাগে না। মানুষকে মরতে

দেখলে আমি বেদনা পাই না। শিউলী, তুমি জান না, আমি আমার কাছে কি ভয়াবহ।

অনঙ্গবাবু শিউলীকে নিয়ে স্টুডিও থেকে ছবি তুলিয়ে এনেছিল। স্টুডিওতে রাজীববাবুকেই ক্যামেরা চালাতে দেখে শিউলী অবাক হয়েছিল।

মাসী বলেছিল—ক্যামেরার কাজ ত' ভালই শিখেছিল। ঐ স্টুডিওটা অনেক সখ করে করলো। আজকাল আর যায় না।

ছবি তোলাবার সময়ে রাজীববাবু একটা পাথরের মূর্তি টেনে এনেছিল। মার্বেলের মূর্তি। একটি ছোট মেয়ে মুখ নিচু করে মালা গাঁথছে। শিউলীকে বলেছিল তারই কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াতে।

শিউলীকে সে নানাভাবে, নানাভংগীতে ক্যামেরায় ধরেছিল।

চুলটা সেই কখনো সামনে এনে, কখনো খোঁপা বেঁধে, আঁচলটার হেরফের করে শিউলীকে নানা সাজে সাজিয়েছিল।

পরে শিউলী জেনে অবাক হয়ে গিয়েছিল, মূর্তিটা রাজীবেরই তৈরী।

সে বলেছিল—আপনি এত জানেন!

শিউলীকে তার নারীত্ব, তার যৌবন সম্পর্কে কোনভাবে সচেতন না করে রাজীব খুব সহজে তার সঙ্গে অনেক কথা বলেছিল।

মাসী, অনঙ্গবাবু, আর এ বাড়ীতে যারা আসে, সেই অনীতা, বেলা, সকলেই খুব আশ্চর্য হয়েছিল।

আশ্চর্য হওয়াটা বিচিত্র নয়। কেন না, রাজীব বাড়ীতে কারো সঙ্গে কথা কইত না। এমন কি, খুব প্রয়োজন না হলে নিজের মা'র সঙ্গেও নয়।

রাজীব একদিন মাথা ধরে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে ছিল।

শিউলীকে বললো—শিউলী, আমার মাথাটা একটু টিপে দেবে?

শিউলী তার মাথা টিপে, মাথায় অডিকোলন দিয়ে বাতাস করে দিয়েছিল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, রাজীব তাকে নিজের সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিল। বলেছিল—

—মানুষকে আমার ঘেন্না করে। আমি কোথাও আনন্দ পাই না। আমার বাবা একজন নামকরা ডাক্তার। তাঁর অনেক পয়সা। মা'কে টাকাপয়সা দিয়েই তিনি আমার সম্পর্কে সব দায়িত্ব এড়িয়েছিলেন। আমার জন্মের পর, আমার পাঁচ বছর বয়সে নাকি আমাকে ভাল স্কুলে রাখতেও চেয়েছিলেন। মা দেয়নি। আমার মনে হয়, মা ভালই করেছিল। সেখানেও আমি সম্মান পেতাম না। আমার জন্মের কলংক আমাকে সেখানেও অনুসরণ করতো।

কেন যে এই রুগ্নতা, এই নিঃসঙ্গতা, আমি জানি না। কোন কিছুই আমার ভাল লাগে না। ক্যামেরা, ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া, কতগুলো জিনিষ যে ধরেছি আর ছেড়েছি, নিজেরই মনে পড়ে না। হয়তো ভাল লাগবে, এই ভেবে একবার প্রেম করতেও চেষ্টা করেছিলাম। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় একজন এ্যাক্ট্রেসের সঙ্গে।

রাজীব একজন নামকরা অভিনেত্রীর নাম শিউলীকে শুনিয়েছিল। জীবনের এই সব জটিলতা আর বিচিত্রতার কথা শিউলী অবাক হয়ে শুনছিল। রাজীব বলেছিল—

—আমাকে দেখেই সে এমন আকুল হয়ে উঠত যে, আমি ভেবেছিলাম তারই নাম প্রেম। একটা মানুষকে সুখী করতে পারছি ভেবে আমার খুব ভাল লাগত। কিন্তু, কিছুদিন বাদেই বুঝলাম, সে আমাকে একটা উপলক্ষ্য হিসেবে চাইছে। আসলে বিশ বছর আগেকার এক সন্তানের মৃত্যুর পুরনো শোক সে ভুলতে চাইছে না। টাকাপয়সার ছড়াছড়ি থাকলে মানুষ যে কত রকম শোক বানিয়ে নেয়, তা যদি জানতে! এই কথা জানবার পর তার সম্পর্কে সমস্ত আগ্রহ আমার নিঃশেষ হয়ে গেল।

—তাঁর সঙ্গে আপনার আর দেখা হয় না?

রাজীব বলেছিল—সে কি আর ডাকে না? প্রায়ই ডাকে। আমিও মাঝে মধ্যে যাই। আশ্চর্য হবে, তারই বাড়ীতে আমি আমার বাবাকেও যেতে আসতে দেখেছি। যত যাই হোক, তিনি ত' চরিত্রটা

বদলাতে পারেননি। আজকাল মালিনী আমায় ডাকে। রেলে যাবার সঙ্গী হতে, এইসব ছোটখাটো ছুতোনাতায়। আজকাল ক্যানসারে ভুগছে। কয়েক লাখ টাকা আর দুখানা বাড়ী নিয়ে মহা মুস্কিলে পড়েছে। তিন ছেলে। তিন ছেলেই মহা কাপ্তেন। মালিনী তাদের বিশ্বাস করে না। আমাকে বলে একটা ব্যবস্থা করে দিতে।

—আপনি দিলেই পারেন।

—পাগল হয়েছ! টাকা টাকা করে অত ভাবনাই বা কেন তার? ছেলেরা যা ইচ্ছে করুক না। উড়িয়ে দিক, পুড়িয়ে দিক! তিন মাসের মাথায় যে মানুষটা মরবে, তার টাকার সম্পর্কে এই রকম অসভ্য আসক্তি দেখে আমার হাসি পায়।

শিউলী বলেছিল—আপনি নিষ্ঠুর!

সে অডিকোলনের পটি রেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল—আপনার সঙ্গে না এতদিনের ভাব? এখন মানুষটা মরবে জেনে শত্তুরেও ত' ভাল ব্যবহার করে! আপনার মন-প্রাণ নেই।

—তুমি সব বোঝ না শিউলী। মা'ও এই কথা বলে। আমি কিছু করলাম না দেখে মা কত কাঁদতো এক সময়, যদি জানতে!

শিউলী বলেছিল—মা'র বুকের উপর বসে মা'কে না দগ্ধে চলে গেলেই ত' পারেন রাজীববাবু?

—পাগল হয়েছ! মাকে তা'হলে কে দেখবে?

—মা'কে কি আপনি দেখেন?

—আমি এ বাড়ী ছেড়ে যাব জানলে মা মাথা খুঁড়ে পাগল হবে। আর, মা'কে বোধহয় আমি ভালবাসি। কথাটা রাজীব এমন অদ্ভুত ভাবে উচ্চারণ করেছিল যে, শিউলী তার দিকে চেয়েছিল। বলেছিল—

—আপনি এক সৃষ্টিছাড়া মানুষ। আপনার জোড়া আমি দেখিনি।

—আমার জোড়া অনেক পাবে না শিউলী।

—ভাগ্যে নেই রাজীববাবু। থাকলে কি সংসার চলতো?

শিউলী তাকে প্রায় ধমক দেবার সুরে কথাগুলো বলেছিল। বলেছিল—মাথাধরা আপনার অনেকক্ষণ ছেড়েছে। যান। কোথাও ঘুরে আসুন।

মেয়েদের চিরদিন কাঁচপোকার মতো সম্মোহনী শক্তি বিস্তার করে টেনে এনে হাসিয়ে কাঁদিয়ে যে মজা দেখে, সেই রাজীব শিউলীকে দেখে অবাক হয়েছিল। তাকে মেয়েরা ধমক দেয় না। সেই মেয়েদের ধমক দেয়।

শিউলী একদিন বলেছিল—রাজীববাবু, আপনি আমাকে বেড়াতে নিয়ে যান না কেন?

বয়সে কাছাকাছি হয়েও রাজীবের সঙ্গে সে খুব সহজ হতে পারত। রাজীব আশ্চর্য হয়ে বলেছিল—আমি যাই জুয়াড়ী, মাতাল, বোম্বেটেদের আড্ডায়। সেখানে তুমি যাবে কি?

অথচ, এই শিউলীকেই নিয়ে সে ট্যাক্সি করে শিবপুরে বোট্যানিকাল-এ বেড়িয়ে এনেছিল।

রাজীবের তোলা সে সব ছবিতে শিউলী উৎরোয়নি।

তার নাকের ডগাটি মোটা, তার থুৎনীর নিচে মাংসের খাঁজ আছে, তার চোখের চাহনী একটু ট্যারা।

তাই, শিউলীর সিনেমায় নামা হলো না।

রাজীব তাকে হঠাৎ মালিনী দেবীর বাড়ীতে, মালিনী দেবীর সবসময়ের সঙ্গী করে দিয়েছিল।

এ-ও একটা চাকরী। এতে মাসে তিনশো টাকা পাওয়া যাবে।

আসলে, সিনেমাতে টাকা খাটাতে যে অবাঙালী ভদ্রলোকটি এসেছিলেন, তিনি শিউলীকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই বয়সের একটি সুন্দরী কুমারী মেয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে টাকাপয়সা খরচ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

তিনি নিজেও নতুন এক পুরুষের বড় মানুষ। ইংরেজী ভালই জানেন। হালফিল জগতে চালু মানুষ হতে গেলে যে যে গুণাগুণ দরকার, সবই তাঁর আছে। তিনি যথাসম্ভব শীঘ্র শিউলীকে এদের সংস্রব থেকে নিয়ে যেতে চাইছিলেন। ব্যাংকক আর হংকং হয়ে আমেরিকা ঘুরে এসে এই বন্দোবস্তটা পাকা করে ফেলবার ইচ্ছে তাঁর।

শিউলীকে মালিনীদেবীর বাড়ীতে চাকরী দেবার জন্যে রাজীব আর মাসীর ঝগড়া হয়েছিল।

রাজীব বুঝতে দিয়েছিল, সে শিউলীকে বাঁচাতে চাইছে। সেই রাজীব, যে বৃত্তি হিসেবে অপর পুরুষের আশ্রিত হবার মধ্যে কোন নীতিগত অসঙ্গতি দেখতে পায় না।

তার এই সব ভাবপ্রবণতা দেখে মাসী অবাক হয়েছিল।

মালিনীদেবী সম্পর্কে শিউলীর অনেক কৌতূহল ছিল। কিন্তু, রোগশয্যায় প্রায় মিশে গিয়ে যে প্রৌঢ়া, আশ্চর্য ফর্সা মহিলা দিনরাত বাঁচতে চেয়ে কাঁদেন, তাঁর মধ্যে সে রাজীবের বর্ণিত মানুষটিকে খুঁজে পায়নি।

মালিনীদেবীর কথা বলবার ধরণ শুনে তার আশ্চর্য লেগেছিল। তিনি বলেছিলেন—এই মৃত্যুর আবহাওয়ায় এ রকম একটি ছোট্ট মেয়েকে এনেছ কেন?

মালিনীদেবীর বাড়ীতে, সে তাঁর ছেলেদের মধ্যে, আত্মীয় পরিজনের মধ্যে, মৃত্যুর সম্পর্কে এমন অবহেলা দেখে আঘাত পেয়েছিল। সে বুঝেছিল, দীর্ঘদিন ধরে মনগড়া অসুখ আর সত্যিকারের অসুখে ভুগে ভুগে তিনি এদের কাছ থেকে অনেক আগেই এক সুদূর নির্বাসনের জগতে সরে গেছেন। তাই, তাঁর আসন্ন দৈহিক মৃত্যুটা এদের আর বিচলিত করছে না। অথচ সে মৃত্যুটা ভয়ংকর।

সে মালিনীদেবীকে অসহ্য যন্ত্রণা পেতে দেখেছে। মর্ফিয়া আর অন্যান্য মাদক ওষুধ দিয়ে যাকে সব সময়ই ঘুম পাড়িয়ে রাখা

হয়, তার আবার সঙ্গিনীর কি প্রয়োজন ছিল, এ চিন্তা শিউলী করেছে।

মালিনীদেবীর ইদানীং আর মর্ফিয়া বা ব্রোমাইডে যন্ত্রণা কমেনি। তিনি শুধু চেঁচিয়েছেন। শিউলীকে চিনতে পারেন নি। তাকে দেখে, নার্সকে দেখে ভয় পেয়েছেন।

তারপর, সকালবেলা, জ্ঞান ফিরতে একবার শুধু ডক্টর কুমার মিত্রকে ডেকেছেন।

জামসেদপুর থেকে আসতে, ব্যস্ত মানুষটির সময় লেগেছে। তখন মালিনীদেবী আর কথা বলতে পারেননি। তাঁর দিকে চেয়ে শুধু চোখের জল ফেলেছেন।

আর, বিশ বছর আগে পরিত্যক্ত একটি মেয়ের নামে শিশু হাসপাতালে ওয়ার্ড খুলে দেবার টাকা কুমার মিত্র দিতে সক্ষম হয়েছেন। সে কথা বারবার বলেছেন তিনি—জয়া, আমি ভার নিচ্ছি। জয়া, তুমি নিশ্চিন্ত হও।

বিকেলবেলা মালিনীদেবী মারা গেছেন।

তিনি জেনে যেতে পারেননি, ডক্টর কুমার মিত্রও জানেননি, শিউলীই তাঁদের সেই পরিত্যক্ত মেয়ে।

কিছু না জেনেই শিউলী চোখের জল ফেলেছে।

ছেলেরা পাশের ঘরে সম্পত্তি নিয়ে অ্যাটর্নীর সঙ্গে কথা বলেছে। এদিকে শিউলী অবাক হয়ে দেখেছে, মৃত্যুকে সুন্দর করবার জন্যে সে কত আয়োজন। রজনীগন্ধার মালায় ঘর সাজানো, ধূপের গন্ধ, মাথা নিচু করে বসে মন্ত্রপাঠ ও গান, সর্বোপরি মৃতার শান্ত, সমাহিত চেহারা দেখে অভিভূত হয়েছে। রাজীব তাকে নিয়ে এসেছে।

অনেক রাত অবধি রাজীব বসে বসে সিগারেট খেয়েছে। শিউলীর মনে হয়েছে, রাজীব বুঝি মালিনীর জন্যে শোক করছে।

রাজীব কিন্তু তার কথাই বলেছে। বলেছে—আমি ত' তোমাকে আর কোথাও নিয়ে যেতে পারব না শিউলী।

তাকে একটা অসম্মানের জীবন থেকে রাজীব বাঁচাতে চায়। এ কথা জেনে, শিউলী মানুষটির মহত্ত্বে অভিভূত হয়েছে। সে হঠাৎ একটা অসম্ভব কথা বলেছে। বলেছে—রাজীববাবু, তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার না ?

রাজীব চুপ করে থেকেছে। তারপর বিষণ্ণ হেসে বলেছে—আমার মা'ও আমাকে সেই কথা বলেছে। তোমাকে সত্যি কথাটা বলি। আমি নিজেকে একেবারেই নষ্ট করেছি। তোমাকে বিয়ে করবার, কোন মেয়েকেই বিয়ে করবার কোন মানে হয় না আমার। শিউলী, যদি পারতাম, আমি তোমাকে বিয়ে করতাম।

শিউলী নিজের ঘরে উঠে গেছে। সে রাতে, সেও কেঁদেছে। নিজের ভাগ্যকে দোষ দিয়ে।

ওদিকে ঠিক দিনে, ঠিক সময়ে, দমদমের রাণওয়েতে একটা প্লেন এসে থেমেছে।

বান নয়, জীবনের আর একটা ঢেউ শিউলীকে আবার সর্বনাশের অজানায় ভাসিয়ে নিয়েছে।

অনেকদিন পরে, অনেক বছর বাদে শিউলী গঙ্গাসাগরের মেলায় এসেছিল।

যে যে সিঁড়ি মাড়িয়ে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছিয়েছে শিউলী, সে সিঁড়িগুলোকে সে ভেঙে দিতে পেরেছিল। হরিদাসী একদিন তার দরজা থেকে অপমান হয়ে ফিরে গিয়েছে। মাসীও কোন সুবিধে করতে পারেনি। তবু, রাজীবকে কেন যেন শিউলী ভুলতে পারেনি।

মাসী মরে যাবার পর রাজীবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে তার ইচ্ছে হয়েছিল। অনেক পুরুষ মানুষকে অনেক ভাবে চিনেও রাজীবের প্রতি তার একটা দুর্বলতা ছিল।

রাজীব দেখা করতে আসেনি। আসতে চাইলেও তার উপায় ছিল না। তাই, আটত্রিশ বছর বয়সে রাজীব, এতদিন যে সস্তা নাটকীয়তাকে উপহাস করেছে, যে মানবীয় দুর্বলতাকে স্বীকার করেনি, তারই শিকার হলো।

মা মারা যাবার পর, সহসা নিজের জীবনের অপরিসীম নিঃসঙ্গতা তাকে ভয় দেখাল। তাই রাজীব একদিন আত্মহত্যার অন্ধকার পরিণতিতে নিজেকে নিমজ্জিত করতে পারল।

শিউলী আঘাত পেয়েছিল।

আজ ছ'বছর বাদেও গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মনে হলো, কিছু কিছু স্মৃতি যেন বোঝার মতো চেপে আছে তার মনে। অনেক টাকার স্বাদ পেয়েছে সে। পুরুষ মানুষের দুর্বলতার নানা চেহারা দেখেছে।

তবু যেন মন থেকে নিঃসঙ্গতা তারও ঘোচেনি।

দুটি পুরুষকে সে কি জীবন থেকে মুছে ফেলতে পেরেছে? দামী গরদের শাড়ী পরে, ঝি-এর হাতে ভেজা কাপড়ের বোঝা দিয়ে বালির ওপর অনভ্যস্ত পায়ে চলতে চলতে শিউলীর মনে হয়, অনিল আর রাজীব, দুজনে যেন দুটো বিদ্রূপ্।

একজন প্রত্যাখ্যান না করলে সে দ্বিতীয় জনকে জানত না। দ্বিতীয়জন প্রত্যাখ্যান না করলে সে জীবনভোর শুধু ভেসে ভেসে বেড়াত না।

এতদিন বাদে রাজীবের জন্যে শুধু করুণা হয়। আর, আর এক-জনের জন্যে আজও যে অনুভূতি হয়, তার নাম যেন দুঃখ। দুঃখ? তাই হবে। যেদিন শিউলী তাকে জানতো, সে দিনগুলোতে পরের জীবনের কলংকের ছোঁয়া লাগেনি। তাই, সে দিনগুলোতে, সে মানুষটার মধ্যে, যা যা ছিল না, যা মনের পাতায় ধূসর হয়ে গিয়েছিল, শিউলী তাদের মধ্যে সেই সব ভালোবাসার রং লাগিয়েছে। তাদের আরো সুন্দর করে নিয়েছে। তাই, তাদের কথা মনে করলে আজ

দুঃখ হয়। যেন দূর দেশের পথের পাশে কত সৌন্দর্য ছিল, সে চোখ ভরে দেখে নেয়নি। যেন, কার সঙ্গে, কবে, কোথায় অনেক কথা বলবার ছিল, শিউলী সে কথা বলেনি। আজ তাই কি যেন হারিয়ে গেছে, কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, সেই দুঃখ মনকে থেকে থেকে ব্যথা দেয়। যে স্মৃতিগুলোতে প্রত্যহের স্পর্শ লাগেনি, সে স্মৃতিগুলোই ভালোবাসবার।

গঙ্গাসাগরে সে কেন এল ?

গঙ্গাসাগরে ডুব দিয়ে সে কি অনেক পুণ্য পাবে ? রূপকথায় যেন কি গল্প ছিল ? এক ডুব দিয়ে কন্যা রূপ পেল। আর এক ডুবে তার অঙ্গ গয়নায় ঝলমল। তখনই তৃপ্ত হয়ে উঠে আসা উচিত। তা না করে সেই মেয়েটি গহীন জলে নামল। আর উঠল না।

শিউলী নিজেই জানে না সে কেন এখানে এল।

সব খামখেয়াল, সব আবদার মেটাবার পয়সা আজ তার আছে। তাই সে এমনি করে সুখ খুঁজে খুঁজে ফেরে।

একটা ছেড়ে আর একটা ধরবার এই মন দেখে একজন মানুষ তাকে সব শখ মেটাবার মতো টাকা দিতে চেয়েছিল। আর একজন বলেছিল—চল, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। তিনি তোমার এই মনের অসুখ ঠিক ধরে দেবেন।

শিউলী দুজনের কথাতেই হেসেছিল।

জন্ম থেকেই যে শুধু ভেসে ভেসে বেড়িয়েছে, সে কেমন করে এক জায়গায় স্থির হবে ?

শিউলী দেখে কত হোগলার চালা, কত অস্থায়ী ঘর।

প্রয়াগের মাঘমেলাতে মানুষ যেমন একমাস কল্পবাস করে, এখানেও তেমনি তিনদিন কল্পবাসের ব্যবস্থা।

ওদিকে রামায়েৎ সাধুদের ভীড়। কপিল দেবের মন্দির। কত সন্ন্যাসীর কত রকমের বিচিত্র নিশান।

তীব্র শীতের বাতাস থেকে থেকে থেকে গা কাঁপিয়ে দেয়। শিউলী শালটা টেনে নিয়ে জড়ায় গায়ে।

সামনে কিসের ভীড় !

ছোট একটি রোগা, ছয়-সাত বছরের মেয়ে আকাশ ফাটিয়ে কাঁদছে।

বিব্রত ইন্সপেক্টরটি তাকে যতবারই প্রশ্ন করছেন—তোমার বাবা কে ? নাম কি ?

সে শুধু বলতে পারছে—বাবার সঙ্গে এসেছিলাম। বাবার সঙ্গে এসেছিলাম। শিউলী দেখে ছিটের সস্তা জামা গায়ে, পানসে ফর্সা রোগা একটা মেয়ে। আরো অনেকে মজা দেখছে দাঁড়িয়ে।

অফিসারটি বলেন—এসে থাকুক তাঁবুতে। লাউডস্পীকারে খবর দিই। আর, বাবার যদি টনক নড়ে থাকে ত', খোঁজ করে করে আসবেই।

তাঁকে অনেক ঝামেলা সামলাতে হচ্ছে, ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে দোষ দেওয়া যায় না।

ভীড় ভেঙে মানুষজন সরে পড়ে। একজন বলতে বলতে যায়—ইচ্ছে করে যে ফেলে পালায়নি, তারই বা প্রমাণ কি মশায় ?

শিউলী এগিয়ে আসে। অফিসারটিকে বলে,

—নমস্কার। ছোট মেয়েটি এখানে একলাটি বসে বসে কাঁদবে ? আমার সঙ্গে ওকে যেতে দেবেন ? নাম ঠিকানা রেখে যাচ্ছি।

অফিসারটি যেন আশ্বস্তই হন্। এমন করে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গছাড়া হয়ে আরো দুটি বুড়ী, একটি মেয়ে এসেছে। এ মেয়েটা কান্নাকাটি করে গোলমালই বাড়াচ্ছে।

মেয়েটা শিউলীর সঙ্গে উঠে আসে।

শিউলীর ঝি মনিবের খামখেয়ালী মেজাজ জানে। সে বকবক করতে করতে আসে পেছনে পেছনে। শিউলী বলে—তোমার কাছে টাকা আছে বাতাসী। খাবার কিনে আন ত ! মেয়েটা অবাক হয়ে শিউলীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

ফেলে রেখেছে। গোটা দুই পুতুল, বাঁশী, আরো একঝুড়ি খেলনা কোলের কাছে নিয়ে সে শিউলীর সঙ্গে গল্প করছে।

শিউলী বলছে—তোর মা'র কথা তোর মনে নেই পুতুল?

—না।

—তোকে রান্না করে দেয় কে?

—বাবা সব করে।

—বাবা তা হ'লে তোকে খুব ভালবাসে?

—বাসেই ত!

—আমাকে তোদের বাড়ী নিয়ে যাবি ত?

—ইস্, তোমার এত এত গয়না, তুমি এত সুন্দর দেখতে, তুমি আমাদের বাড়ী থাকতে পারবে কেন?

এমনি সময়েই পুতুলকে খুঁজে খুঁজে তার বাবা এসেছে। আর, মুখ তুলে মানুষটিকে দেখে শিউলীর মুখে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

অনিল বলেছে—তুমি?

—আমি।

ব'লে এই সুন্দর মানুষটির চোখ দিয়ে কেন এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছে, তা পুতুল বোঝেনি।

পুতুলকে তার মাসীর কাছে রেখে আবার ফিরে এসেছে অনিল। এতক্ষণ বাবা ছাড়া অন্য কারো নাম পুতুলের মুখে শোনেনি শিউলী। অথচ এখন জানা গেছে, তার সঙ্গে অন্য মানুষও আছে। মাসী, মাসীর মেয়ে, তাকে ভালবাসবার অনেক মানুষ।

এক হাতে ছোট মেয়েটিকে, অন্য হাতে খেলনাগুলোর ভার সামলাতে সামলাতে বিব্রত হয়ে অনিল চলে গেছে।

ফিরে এসে দেখেছে শিউলী তেমনি গালে হাত দিয়ে মাটিতে বসে আছে। শিউলীর গয়না, কাপড়, দামী শাল, সব দেখে অনিলের

কথা বলে সহজ হবার সাহসটা চট্ করে আসেনি। সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে, পুতুলকে না পেয়ে নাকাল হবার কথাটা বলে তবে সে সহজ হতে পেরেছে।

শিউলীই বলেছে—বিয়ে কবে করলে অনিলবাবু?

অনিল বলেছে—বছর আষ্টেক আগে। তিন বছরও রইল না। ঐ মেয়েকে এক বছরের রেখে……

—কোথায় বিয়ে করেছিলে? মামাবাড়ী থেকেই বিয়ে দিল?

—কোথায়! সে বাড়ী ত আমি ছেড়ে এসেছিলাম শিউলী। তখন আমি ডোমজুড়ে। তেলকলে চাকরী করি। ওদের বাড়ীতে থাকতাম। ঐ হয়ে গেল আর কি!

—আর বিয়ে করনি?

—আবার!

আবার দুজনে কথা খুঁজে পায়নি। চুপ করে থেকেছে। শিউলী মুখ নিচু করে বালিতে আঁক কেটেছে অকারণে। অনেকক্ষণ বাদে অনিল সাহস সঞ্চয় করে বলেছে—একটা কথা! কত বছর ধরে ভেবেছি আর ভেবেছি। শুধোব, শিউলী?

শিউলী ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছে। অনিল বলেছে—সেদিন, তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস করে সত্যি এসেছিলে?

অবাধ্য চোখের জল এবার টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়েছে। শিউলী ঘাড় নেড়ে বলেছে—হ্যাঁ। এসেছিলাম অনিলবাবু।

অনিল তার দুটি হাত ধরেছে সাহস করে। বলেছে, বিশ্বাস কর শিউলী, আমি তোমায় ঠকাইনি। আমার সাহসে কুলোয়নি। সে কথা তুমি বিশ্বাস কর?

শিউলী ঘাড় নেড়ে জানিয়েছে, হ্যাঁ। সে বিশ্বাস করে। অনিলের সেদিনের ভীরুতা, সেই সংশয়কে সে অনুভব করে। তাই অনিলের ওপর তার কোন রাগ নেই।

হঠাৎ শিউলী ফুলে ফুলে কেঁদে বলেছে—সেদিন যদি তুমি আসতে! যদি আমাকে নিয়ে যেতে! তারপরে সে যে কি জীবন অনিলবাবু! যদি জান্‌তে!

এই পরিবেশ, এই সুন্দর মেয়েটি, সব কিছু অনিলকে যেন বাস্তব থেকে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। যা হয় না, যা হতে পারে না তাকেই যেন জোর করে সত্যি বলে বিশ্বাস করতে চেয়েছে অনিল। তাই সে বলেছে—শিউলী, আবার কি হয় না?

কি হয় না? কি হয়? কি তাকে বলতে চাইছে অনিল? শিউলী মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থেকেছে। অনিল বলেছে—আজ কি তুমি আসতে পার না?

আজ? এতদিন পরে? হঠাৎ শিউলী বুঝেছে, তার জীবনে অনিল যেমন, অনিলের জীবনে শিউলীও তেমনই এক প্রথম ভালবাসা। সেও হঠাৎ স্বপ্নে বিশ্বাস করতে চেয়েছে। জোর করে, বাস্তবকে দূরে ঠেলে দিয়ে বিশ্বাস করতে চেয়েছে, ঐ পুরুষটির সঙ্গে গেলে সে সংসার পাবে, সন্তান পাবে, ভালবাসা পাবে।

আজকের শিউলী নয়। ষোল বছর আগেকার সেই উনিশ বছরের শিউলী তার মুখ দিয়ে কথা কয়ে উঠেছে।

—তুমি আমাকে নিয়ে যাবে?

—যাব শিউলী।

—আবার ভুলে যাবে না?

—না, শিউলী।

তখন শিউলী বলেছে—তুমি এসো অনিলবাবু। আজকেই যাব। আজ রাতেই।

অনিল বলেছে—আমি সন্ধেবেলাই আসব শিউলী।

শিউলী ঝিকে টাকা দিয়ে ছুটি করে দিয়েছে। সারাদিন সে অস্থির হয়ে স্যুটকেশ গুছিয়েছে। তারপর, বিকেলবেলা, চুল বেঁধে,

কাপড় ছেড়ে, বসে বসে নিজের অস্থির অশান্ত হৃদয়ের শব্দ শুনতে শুনতে সে চোখ বুজেছে।

শিউলী চোখ মেলেছে। অন্ধকার। তবে কি অনিল এসে ফিরে গেল? হাতঘড়িতে দেখেছে মোটে সাতটা বাজে।

তারপর, ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ, আর দূরে দূরে মেলার কলরব শুনতে শুনতে শিউলীর চোখের সামনে থেকে সব স্বপ্ন ঝরে গিয়েছে।

এ কি পাগলামি করেছে সে? সে, শিউলী, যাকে আজ কোন অনিলই একটা সম্মানের জীবনে, শান্তির জীবনে নিয়ে যেতে পারবে না!

অনিল। রোগা, আধময়লা জামা-কাপড় পরা একজন অন্য মানুষ। এ তার সে অনিল নয়। সেও আর সে শিউলী নেই। শিউলী এ কথা যেমন জানছে, সব ভুলে, সব পরিচয় মুছে, ঐ মানুষটির ঘরে যেতে পারলে সে সুখ পেত, শান্তি পেত, তেমনি এও জানছে, আর তা হয় না।

আর তা হয় না। কেন অনিল তুমি আমার মুখের কথায় বিশ্বাস করেছ? যে জীবন যাপন করেছে শিউলী, সে জীবন আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

যে প্রেম চলে গেছে, তাকেও আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

শিউলী তাড়াতাড়ি উঠে তাঁবুর দরজা টেনে বন্ধ করে দিয়েছে। যা হয় না, যে সুখ ধরা যায় না, যে প্রেম পাওয়া যায় না, তারই দুঃখে শিউলী কেঁদেছে।

অনিল ঠিক সময়েই এসেছে। অনিল এসেছে, অনিল ডেকেছে। তারপর অপেক্ষা করে করে অনিল ফিরে গিয়েছে।

বালির ওপর দিয়ে তার সেই ক্লান্ত, আশাহত পায়ের শব্দ শিউলী শুনতে পায়নি। তার নিজের কান্নাই সব শব্দ ডুবিয়ে দিয়ে তার চারিপাশে একটা অন্য শব্দের জগৎ তৈরী করে রেখেছে।

এতদিন যেন তার প্রথম প্রেমের প্রতি বিশ্বস্ততা শিউলী আর তার জীবনের স্রোতের মধ্যে একটা আলগা বাঁধন দিয়ে রেখেছিল। যেন এতটুকু মাটির সঙ্গে তাকে জড়িয়ে রেখেছিল। এখন শুধু বন্যা। এখন শুধু অকূল।

সে পরগাছা, তাই জীবন তাকে অত সহজে উপড়ে ফেলে দিতে পারল। কেউ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক অন্ধকার পরিণতির অকূলে।

ভেসে চলতে চলতে, কাঁদতে কাঁদতে, শিউলী এখন সেই অকূলকে দেখতে পেল!

